সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

তখনো ভারত স্বাধীন হয়নি। ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়নি। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা লাভ আর মুসলমানদের জন্যে পৃথক আবাসভূমি এ দুটো বিষয়ই চূড়ান্তভাবে কার্যকর হবার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মুসলমানরা একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিল, যেখানে সর্বক্ষেত্রে কার্যকর হবে কুরআন সুন্নাহ্‌র বিধান। কিন্তু যারা এই রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তাদের মধ্যে না ছিল ইসলামের যথার্থ জ্ঞান, না ছিল ইসলামী চরিত্র আর না ছিল নিরেট ইসলামী সমাজ গড়ার মন মানসিকতা। তাদের মধ্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদী একটা চিন্তা ছিল মাত্র। স্রেফ মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা আসাটাকেই কোনো একটি দেশ ইসলামী রাষ্ট্র হবার জন্যে যথেষ্ট বলে তারা ধরে নিয়েছিল। সে দেশের আইন কানুন, শিক্ষা সংস্কৃতি, অর্থনীতি রাজনীতি যা-ই হোকনা কেন?

এটা ছিল একটা চরম ভ্রান্ত ধারণা। এই অবাস্তব পন্থায় কিছুতেই একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বা ইসলামী বিপ্লব সাধনের একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম পন্থা রয়েছে। পৃথিবীর যে দেশের লোকেরাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, তাদেরকে অবশ্যি সেই নির্দিষ্ট নিয়মপন্থা অনুসরণ করতে হবে। এ সময় মাওলানা মওদূদী (রঃ) এই কথাগুলো পরিষ্কারভাবে সকলের দৃষ্টিগোচর করা নিজের দায়িত্ব মনে করেন এবং সে হিসেবে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রেচী হলে এ সম্পর্কে এক অনুপম বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যের শিরোনাম ছিলো 'ইসলামী হুকুমত কেসতরাহ কায়েম হোতি হায়?' এর সরল অনুবাদ হলো, 'ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?' বক্তব্যটি সাথে সাথে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। অবশ্য বাংলা ভাষায় এটি 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' নামে পরিচিত।

কয়েক দশক আগে পুস্তিকাটি বাংলা সাধু ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। এ যাবত পুস্তিকাটির বহু সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। বহুবারের মুদ্রণের ফলে এতে স্থায়ীভাবে কিছু মুদ্রণ ত্রুটি ঢুকে পড়ে। সে কারণে এবং চলতি ভাষার দাবী পূরণের লক্ষ্যে পুস্তিকাটি আমরা পূনঃ অনুবাদ করেছি চলতি ভাষায়।

এই বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশের সময় মাওলানা মওদূদী (র) নিজেই প্রচলিত বাইবেল থেকে ইসলামী রাষ্ট্র সংক্রান্ত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কিছু বাণী এর সাথে সংযোজন করে দেন। এই নতুন সংস্করণে আমরা সেই সংযোজনটিও সন্নিবেশিত করে দিয়েছি।

বাংলাদেশে যারা ইসলামী বিপ্লব সাধন করতে চান, পুস্তিকাটি আগেও তাদের দিশারী ছিল, ভবিষ্যতেও অম্লান দিশারীর কাজ করবে বলে আমরা আশা করি।

আবদুস শহীদ নাসিম

১৮.১১.১৯৯১

সূচীপত্র

●

“গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা তো সেইসব লোকদের হাতেই আসবে ,যারা ভোটারদের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হবে। ভোটারদের মধ্যে যদি ইসলামী চিন্তা ও মানসিকতাই সৃষ্টি না হয়, যথার্থ ইসলামী নৈতিক চরিত্র গঠনের আগ্রহই যদি তাদের না থাকে এবং ইসলামের সেই সুবিচারপূর্ণ অলংঘনীয় মুলনীতিসমূহ তারা মেনে চলতে প্রস্তুত না হয়, যেগুলোর ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, তবে তাদের ভোটে কখনো খাঁটি মুসলমান নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে আসতে পারবেনা।”

●

“এ কাজের জন্যে এমন একদল দুঃসাহসী যুবকের প্রয়োজন, যারা সত্যের প্রতি ঈমান এনে তার উপর পাহাড়ের মতো অটল হয়ে থাকবে। অন্য কোনো দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবেনা। পৃথিবীতে যাই ঘটুকনা কেন, তারা নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পথ থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হবেনা।”

●

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

স্বাভাবিক নিয়মে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার কর্মপন্থা আমি সুস্পষ্টভাবে এ প্রবন্ধে তুলে ধরতে চাই। আমি দেখতে পাচ্ছি, বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্রের নাম শিশুদের খেলনায় পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন পন্থা ও শ্রেণীর লোকেরা ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা ও তা প্রতিষ্ঠার খেয়াল ব্যক্ত করছেন। কিন্তু এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে এমন সব অদ্ভুত পথ ও পন্থার প্রস্তাব তারা করছেন, যেসব পথ ও পন্থায় এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সেরকমই অসম্ভব, মটর গাড়ীতে করে আমেরিকায় পৌঁছা যেমন অসম্ভব। এরকম অসার কল্পনার (Loose thinking) কারণ হলো, কোনো না কোনো ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে তাদের অন্তরে এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার খায়েশ পয়দা হয়ে গেছে, যার নাম হবে 'ইসলামী রাষ্ট্র' । কিন্তু এই রাষ্ট্রটির ধরণ ও বৈশিষ্ট্য কি হবে, নিরেট বৈজ্ঞানিক (Scientific) পন্থায় তারা তা জানার চেষ্টা করেনি। আর এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিতই বা হয় কোন্ পন্থায়, তাও জানবার কোশেশ তারা করেনি। এমতাবস্থায়, বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় ভালোভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বাভাবিক বিবর্তন

যে কোনো ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থাই যে কৃত্রিম পন্থায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা, সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুমাত্র জ্ঞান রাখেন, এমন সবাই তা জানেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থা এক জায়গা থেকে তৈরি করে এনে অন্য জায়গায় স্থাপন করার মতোও কোনো বস্তু নয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থা তো কোনো একটি সমাজের মধ্যকার নৈতিক চরিত্র, চিন্তাচেতনা, মন মানসিকতা, সভ্যতা সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ঐতিহ্যগত কার্যকারণের সমন্বিত কর্ম প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে জন্ম লাভ করে। এর জন্যে কিছুটা প্রাথমিক উপায় উপাদান (Prerequisites), কিছু সামাজিক ও সামষ্টিক চেষ্টা তৎপরতা এবং কিছু আবেগ উদ্দীপনা ও ঝোঁক প্রবণতা বর্তমান থাকা চাই, যেগুলোর সমন্বিত চাপের মুখে স্বাভাবিক পন্থায় রাষ্ট্র ব্যবস্থা অস্তিত্ব

লাভ করে থাকে। যুক্তি বিদ্যায় সূত্র বিন্যাসের ভিত্তিতে যেমন সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়, রসায়ন শাস্ত্রে রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উপাদান সমূহকে বিশেষ পন্থায় সংমিশ্রিত করলে যেমন সেগুলোর সমগুণ সম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থই প্রস্তুত হয়, ঠিক একইভাবে, সমাজ বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী, একটি রাষ্ট্র কেবল সেই পরিবেশের দাবীর ফলশ্রুতিতেই জন্ম লাভ করে, যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় কোনো সমাজে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে।

আর রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি হবে ? তাও নির্ভর করে সমাজের সেই পরিবেশ ও দৃষ্টিভংগির উপর, যার চাপের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র জন্ম লাভ করবে। যেমন, তর্ক শাস্ত্রে এক ধরনের সূত্র বিন্যাসের ফলশ্রুতিতে অন্য ধরনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ হতে পারেনা। যেমন, রসায়ন শাস্ত্রে সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন রাসায়নিক উপাদান সমূহের সংমিশ্রণে একটি ভিন্নধর্মী যৌগিক পদার্থ তৈরি হতে পারেনা। যেমন, লেবু গাছ লাগানোর পর তা বড় হয়ে আম ফলাতে পারে না। ঠিক তেমনি, উপায় উপাদান এবং কার্যকারণ যদি একটি বিশেষ প্রকৃতির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে হয়ে থাকে, আর সেগুলোর সমন্বিত কার্যক্রমও যদি হয় সেই বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রেরই আত্মপ্রকাশের অনুকূলে, তাহলে ক্রমবিকাশের পর্যায়সমূহ পার হয়ে রাষ্ট্র যখন পূর্ণতা লাভের দ্বার প্রান্তে উপনীত হবে, তখন এসব উপায় উপাদান ও কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তা কিছুতেই হতে পারেনা।

এ বক্তব্য থেকে আপনারা আমাকে অদৃষ্টবাদের (Determinism) প্রবক্তা মনে করবেননা। একথাও মনে করবেননা যে, আমি মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধিকারকে অস্বীকার করছি। নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারণে ব্যক্তি ও সমষ্টির ইচ্ছাশক্তি এবং কার্যক্রমের ভূমিকা বিরাট। কিন্তু আমি আসলে একটি কথাই প্রমান করার চেষ্টা করছি। আর তাহলো, যে ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থাই সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য হবে, প্রথম থেকেই ঠিক সে ধরনের রাষ্ট্রের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল উপায় উপাদান সংগ্রহ করা এবং ঠিক সেই লক্ষ্যেই পৌঁছুবার মতো কর্মপন্থা অবলম্বন করা একান্ত অপরিহার্য।

আমরা যে বিশেষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, সে প্রকৃতির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে অবশ্যি ঠিক সেরকম আন্দোলন সৃষ্টি হতে হবে। সে রকম ব্যক্তিগত, দলীয় ও সামাজিক চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। সে ধরনের

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেতৃত্ব এবং সে রকম সামাজিক কার্যক্রম ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কারণ, এগুলোই বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বাভাবিক দাবী। এ সব উপায় উপাদান ও কার্যকারণের যখন সমাহার ঘটে এবং এক দীর্ঘ প্রাণান্তকর চেষ্টা সংগ্রামের পর তাদের মধ্যে এমন অপ্রতিরোধ্যে শক্তি ও বলিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়ে যায়, যার ফলে তাদের গড়া এই সমাজে অন্য কোনো ধরনের বাতিল ব্যবস্থার পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন এর অপরিহার্য স্বাভাবিক পরিণতিতে সেই বিশেষ রাষ্ট্র ব্যবস্থারই আত্মপ্রকাশ ঘটে, যার জন্যে এই সকল উপায় উপাদান ও কার্যকারণের শক্তি সমষ্টিগতভাবে চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়েছে।

যেমন একটি বীজ। তার থেকে অংকুরিত হলো একটি গাছ। তার অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহ তাকে প্রতিপালিত করে পৌঁছে দিলো একটি পর্যায়ে। তখন এ গাছ থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে সেই ফলই ফলতে থাকবে, যা ফলানোর জন্যে তার অভ্যন্তরীণ শক্তি ও উপায় উপাদানসমূহ দীর্ঘদিন ধরে রস সিঞ্চন করে আসছিল। এই অতি সত্য বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে আপনাকে একটি কথা স্বীকার করে নিতেই হবে। তাহলো, আন্দোলন, নেতৃত্ব, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক চরিত্র এবং কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশলসহ প্রতিটি উপাদান যেখানে একটি বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সম্পূর্ণ অনুকূল ও উপযোগী তৎপরতায় বলিষ্ঠভাবে সক্রিয়, এ সবের পরিণামে সেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার আশা করাটা মুর্খতা, খামখেয়ালী, অসার কল্পনা এবং অনভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আদর্শিক রাষ্ট্র (IDEOLOGICAL STATE)

আমরা যে রাষ্ট্রকে 'ইসলামী রাষ্ট্র' বলে আখ্যায়িত করছি, তার প্রকৃত রূপটা কি? কী তার প্রকৃতি? কি তার ধরন? কি তার বৈশিষ্ট্য ও আসল পরিচয়? -তা আমাদের ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার। ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, জাতীয়তাবাদের নাম গন্ধও এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ জিনিসটিই ইসলামী রাষ্ট্রকে অন্য সব ধরনের রাষ্ট্র থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এ হচ্ছে নিছক একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। এ ধরনের রাষ্ট্রকে আমি ইংরেজীতে 'IDEOLOGICAL STATE' বলবো। এমন আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের সাথে মানুষ সব সময় পরিচিত ছিলনা। আজও পৃথিবীতে

এধরনের কোনো আদর্শিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নেই।* প্রাচীনকালে মানুষ বংশীয় বা শ্রেণীগত রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত ছিলো। অতপর গোত্রীয় এবং জাতীয় রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত হয়। এমন একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের কথা মানুষ তার সংকীর্ণ মানসিকতায় কখনো স্থান দেয়নি, যার আদর্শ গ্রহণ করে নিলে বংশ, গোত্র, জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশীদার হয়ে যাবে।

খৃষ্টবাদ এর একটি অস্পষ্ট নকশা লাভ করেছিল। কিন্তু সেই পূর্ণাংগ চিন্তা কাঠামো তারা লাভ করেনি, যার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ফরাসী বিপ্লবে আদর্শিক রাষ্ট্রের একটি ক্ষীণ রশ্মি মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল বটে, কিন্তু তা অচিরেই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অন্ধ গহ্বরে তলিয়ে যায়।[১] কমিউনিজম আদর্শিক রাষ্ট্রের ধারণা বিশেষভাবে প্রচার করে। এমনকি এ মতবাদের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপনেরও কোশেশ করে। এর ফলে বিশ্ববাসীর মনে আদর্শিক রাষ্ট্রের ক্ষীণ ধারণাও জন্ম নিতে থাকে। কিন্তু অবশেষে এর ধমনীতেও ঢুকে পড়লো জাতীয়তাবাদের তীর্যক ভাবধারা। জাতীয়তাবাদ কমিউনিজমের আদর্শিক ধারণাকে ভাসিয়ে নিয়ে ডুবিয়ে দিলো সমুদ্রের তলদেশে।

পৃথিবীর প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত একমাত্র ইসলামই হচ্ছে সেই আদর্শ নীতি, যা জাতীয়তাবাদের যাবতীয় সংকীর্ণ ভাবধারা থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিরেট আদর্শিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। আর একমাত্র ইসলামই হচ্ছে সেই মহান আদর্শ, যা গোটা মানব জাতিকে তার এ আদর্শ গ্রহণ করে অজাতীয়তাবাদী বিশ্বজনীন রাষ্ট্র গঠনের আহবান জানায়।

বর্তমান বিশ্বে যেহেতু এমন একটি রাষ্ট্রের ধারণা অপরিচিত এবং যেহেতু বিশ্বের সবগুলো রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবস্থা এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই কেবল অমুসলিমরাই নয়, স্বয়ং মুসলমানরা পর্যন্ত এমন একটি রাষ্ট্র এবং এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা (Implications) অনুধাবন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। যারা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছে বটে, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার ধারণা গ্রহণ করেছে পুরোপুরিভাবে ইউরোপীয় ইতিহাস, রাজনীতি ও

---

* মনে রাখা দরকার, এটা ১৯৪০ সালের কথা।- অনুবাদক

১. এ বিপ্লবের ভিত্তিই ছিলো ঘৃণা এবং বিদ্বেষের উপর। তাই শুরু থেকেই নিজ জাতির লোকদের উপর চরম অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয় এবং এতো নির্মম গণহত্যা চালানো হয়, যা চেংগিস এবং হালাকু খানের বর্বরতাকেও ম্লান করে দেয়। অতঃপর সে বিপ্লব জাতীয়তাবাদের দিকে মোড় নেয়। [গ্রন্থকার]

সমাজ বিজ্ঞান (Social Science) থেকে, তাদের মন মস্তিষ্কে এ ধরনের আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা কিছুতেই স্থান পায়না। উপমহাদেশের বাইরেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে, সেসব দেশেও এ ধরনের লোকদের হাতেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এসেছে। জাতীয় রাষ্ট্র (National State) ছাড়া আর কোনো ধরনের রাষ্ট্রের কথা তারা কল্পনাও করতে পারেনা। কারণ, তাদের মন মস্তিষ্ক তো ইসলামের জ্ঞান, চেতনা এবং আদর্শিক রাষ্ট্রের ধারণা থেকে সম্পুর্ণ মুক্ত। এই উপমহাদেশেও যারা সে ধরনের শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেছে, তারাও এ জটিল সমস্যায় জর্জরিত।

ইসলামী রাষ্ট্রের নাম মুখে এরা উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু যে শিক্ষা দীক্ষায় বেচারাদের মস্তিষ্ক গঠিত হয়েছে, তা থেকে ঘুরে ফিরে কেবল সেই 'জাতীয় রাষ্ট্রের' চিত্রই বার বার তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। জ্ঞানত কিংবা অজ্ঞতাবশত এরা কেবল জাতি পূজার (Nationalistic Ideology) বেড়াজালেই ফেঁসে যায়। তারা যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর কথাই চিন্তা করুক না কেন, তা করে থাকে জাতীয়তাবাদেরই ভাবধারার ভিত্তিতে। ইসলমী রাষ্ট্র সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গতানুগতিক ধারণা পোষণ করে।

তারা মনে করে, 'মুসলমান' নামের যে 'জাতিটি' রয়েছে, তার হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিংবা অন্তত রাজনৈতিক নেতৃত্ব এলেই তা ইসলামী রাষ্ট্র হবে। আর এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে তারা যতোই চিন্তা ভাবনা করে, অন্যান্য জাতির অবলম্বিত কর্মপন্থা ছাড়া নিজেদের সেই জাতিটির জন্যে অন্য কোনো কর্মপন্থাই তাদের নজরে পড়েনা। এই ধারণাই তাদের মগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যেসব উপায় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে, তারাও ওসব উপায় উপাদানের সমন্বয়েই তাদের জাতিটিকে গঠন করবে। তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করে দেয়া হবে।[২] তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি করা হবে। জাতীয়

---

২. ১৯৪০ সালে যখন এই বক্তৃতাটি উপস্থাপন করা হয়, তখন এই উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে নিছক একটি জাতি মনে করে তাদেরকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সংগঠিত করার পরিণতি কারো বুঝে আসেনি বটে, কিন্তু ১৯৭১ সালে যখন ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মুসলমানকে বিভক্ত করে দিলো এবং স্বয়ং মুসলমানের হাতে মুসলমানের ইতিহাসের নজীরবিহীন গণহত্যা অনুষ্ঠিত হলো, তখন বিষয়টি সকলের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো। অতঃপর ১৯৭২ সালে বিশ্ববাসী সিন্ধুর ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চেহারাও দেখে নিল। এ আন্দোলনের দাবী ছিলো সিন্ধুভাষী সকল মুসলমান অমুসলমান এক জাতি। আর সেখানকার যেসব মুসলমান সিন্ধু ভাষী নয়, তারা ভিন্নজাতি এবং তাদের সিন্ধুতে থাকার অধিকার নেই। [গ্রন্থকার]

গার্ডবাহিনী সংগঠিত করা হবে। গঠন করা হবে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী। যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, সেখানে গণতন্ত্রের স্বীকৃত নীতি 'সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন' (Majority Rule) এর ভিত্তিতে তাদের জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হবে। আর যেখানে তারা সংখ্যালঘু, সেখানে তাদের 'অধিকার' সংরক্ষিত হবে।

তারা মনে করে, তাদের স্বাতন্ত্র্য ঠিক সেভাবে সংরক্ষিত হওয়া উচিত, যেভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্রতিটি সংখ্যালঘু জাতি (National minority) নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চায়। তারা চায়, শিক্ষা, চাকুরী এবং নির্বাচনী সংস্থাসমূহে নিজেদের কোটা নির্ধারিত হবে। নিজেদের প্রতিনিধি নিজেরা নির্বাচন করবে। একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মন্ত্রী সভায় তাদের শরীক করানো হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি জাতীয়তাবাদী চিন্তা তাদের চিন্তা শক্তিকে গ্রাস করে রেখেছে। এসব জাতীয়তাবাদী চিন্তা প্রকাশ করার সময় তারা উম্মাহ, জামায়াত, মিল্লাত, আমীর ইতায়াত প্রভৃতি ইসলামী পরিভাষাই মুখে উচ্চারণ করে। কিন্তু এই শব্দগুলো তাদের কাছে জাতীয় ধর্মবাদের জন্য ব্যবহৃত শব্দাবলীরই সমার্থক। সৌভাগ্য বশত তারা এ শব্দগুলো পুরানো ভান্ডারে তৈরী করাই পেয়ে গেছে এবং এগুলো দিয়ে তাম্র মুদ্রার উপর স্বর্ণমুদ্রার মোহরাংকিত করার সুবিধে পাচ্ছে।

আপনারা যদি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের সঠিক পরিচয় উপলব্ধি করে নিতে পারেন, তাহলে একথাটি বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না যে, এধরনের জাতীয়তাবাদী চিন্তাপদ্ধতি, কার্যসূচী এবং আন্দোলন প্রক্রিয়া দ্বারা আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ এ মহান কাজের সূচনাই হতে পারে না। সত্য কথা বলতে কি, জাতীয়তাবাদের প্রতিটি অংগ একেকটি তীক্ষ্মধার কুঠারের মতো, যা আদর্শিক রাষ্ট্রের মূলে কুটারাঘাত করে, তাকে বিনাশ করে দেয়।

আদর্শবাদী রাষ্ট্রে যে ধারণা (IDEA) পেশ করে, তার মূল কথাই হচ্ছে, আমাদের সামনে 'জাতি' বা 'জাতীয়তাবাদের' কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের সম্মুখে রয়েছে শুধু মানুষ বা মানব জাতি। তাদের কাছে আমরা এক মহান আদর্শ এ উদ্দেশ্যে পেশ ও প্রচার করবো যে, এ আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্যেই তাদের সকলের কল্যাণ ও সাফল্য নিহিত রয়েছে। এই আদর্শ গ্রহণকারী সকল মানুষ ঐ আদর্শিক রাষ্ট্রটি পরিচালনায় সমান অংশীদার।

এবার একটু চিন্তা করে দেখুন, যে ব্যক্তির মন মগজ, ভাষা বক্তব্য, কাজ কর্ম, তৎপরতা প্রভৃতি প্রতিটি জিনিসের উপর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও জাতিপূজার মোহরাংকিত হয়ে আছে, সে কী করে এই মহান বিশ্বজনীন আদর্শিক দৃষ্টিভংগি নিয়ে চলতে সক্ষম হবে ? সংকীর্ণ জাতি পূজায় অন্ধ বিভোর হয়ে সে নিজের হাতেই তো বিশ্ব মানবতাকে আহ্বান জানাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। প্রথম কদমেই তো সে নিজের পজিশনকে ভ্রান্তির বেড়াজালে নিমজ্জিত করেছে। বিশ্বের যেসব জাতি জাতীয়তাবাদী বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে আছে, জাতি পূজা এবং জাতীয় রাষ্ট্রই যাদের সমস্ত ঝগড়া লড়াইর মূল কারণ, তাদের পক্ষে বিশ্ব মানবতাকে কল্যাণের আদর্শের প্রতি আহ্বান করা সম্ভব নয়। যারা নিজেদের জাতীয় রাষ্ট্র এবং নিজ জাতির অধিকারের জন্যে ঝগড়ায় নিমজ্জিত, তারা কি বিশ্ব মানবতার কল্যাণের কথা চিন্তা করতে পারে? লোকদেরকে মামলাবাজী থেকে ফিরানোর আন্দোলন আদালতে মামলা দায়ের করার মাধ্যমে আরম্ভ করা কি যুক্তি সংগত কাজ হতে পারে?

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক রাষ্ট্র

ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তার গোটা অট্টালিকা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধারণার মূল কথা[৩] হলো, বিশ্ব সাম্রাজ্য আল্লাহর। তিনিই এ বিশ্বের সার্বভৌম শাসক। কোনো ব্যক্তি, বংশ, শ্রেণী, জাতি, এমনকি গোটা মানবজাতিরও সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। আইন প্রণয়ন এবং নির্দেশ দানের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট।

এই রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে, এখানে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। আর এ প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা মানুষ সঠিকভাবে লাভ করতে পারে মাত্র দুটি পন্থায়। হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি কোনো মানুষের নিকট আইন ও রাষ্ট্রীয় বিধান অবতীর্ণ হবে এবং তিনি তা অনুসরণ ও কার্যকর করবেন। কিংবা মানুষ সেই ব্যক্তির অনুসরণ ও অনুবর্তন করবে, যার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আইন ও বিধান অবতীর্ণ হয়েছে।

এই খিলাফত পরিচালনার কাজে এমন সব লোকই অংশীদার হবে, যারা এই আইন ও বিধানের প্রতি ঈমান আনবে এবং তা অনুসরণ ও কার্যকর করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। তাদেরকে এমন স্থায়ী অনুভূতির সাথে এ মহান

---

৩. বিস্তারিত জানার জন্যে আমার ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ পুস্তিকাটি দেখুন। [গ্রন্থকার]

কাজ পরিচালনা করতে হবে যেঃ সামষ্টিকভাবে আমাদের সকলকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেককে এর জন্যে সেই মহান আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে, গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই যার অবগতিতে রয়েছে। যার জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই গোপন নেই।

এই চিন্তা প্রতিটি মুহূর্ত তাদের এ অনুভূতিকে জাগ্রত রাখবে যে, মানুষের উপর নিজেদের হুকুম ও কর্তৃত্ব চালানোর জন্যে, জনগণকে নিজেদের গোলাম বানানোর জন্যে, তাদেরকে নিজেদের সম্মুখে মাথা নত করতে বাধ্য করার জন্যে, তাদের থেকে ট্যাক্স আদায় করে নিজেদের জন্যে বিলাসবহুল অট্টালিকা নির্মাণ করার জন্যে, আর স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিলাসিতা, আত্মপূজা এবং হঠকারিতার সামগ্রী পূঞ্জিভূত করার জন্যে আমাদের উপর খিলাফতের এই মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। বরঞ্চ এই বিরাট দায়িত্ব আমাদের উপর এইজন্যে অর্পিত হয়েছে, যেনো আল্লাহর বান্দাদের উপর তাঁরই দেয়া ইনসাফ ভিত্তিক আইন ও বিধান কার্যকর করি এবং নিজেরা নিজেদের জীবনে তা পুরোপুরি অনুসরণ ও কার্যকর করি। এই বিধানের অনুসরণ এবং তা কার্যকর করার ব্যাপারে আমরা যদি বিন্দুমাত্র ক্রটি করি, এ কাজে যদি অণু পরিমাণ স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বিদ্বেষ, পক্ষপাতিত্ব, কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার অনুপ্রবেশ ঘটাই, তাহলে আল্লাহর আদালতে এর শাস্তি অবশ্যি আমাদেরকে ভোগ করতে হবে, দুনিয়ার জীবনে শাস্তি ভোগ থেকে যতোই মুক্ত থাকিনা কেন?

এই মহান আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় অট্টালিকা তার মূল ও কান্ড থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর শাখা প্রশাখা পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে ধর্মহীন রাষ্ট্রে (Secular states) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে থাকে। তার গঠন প্রক্রিয়া, স্বভাব প্রকৃতি সবকিছুই সেক্যুলার রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। ইসলমী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা জন্যে প্রয়োজন এক বিশেষ ধরনের মানসিকতা। এক স্বতন্ত্রধর্মী চরিত্র বৈশিষ্ট্য। এক অনুপম কর্মনৈপূণ্য। এ রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, কোর্ট কাচারী, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আইন কানুন, কর ও খাজনা পরিচালনা পদ্ধতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ, সন্ধি প্রভৃতি সব বিষয়ই ধর্মহীন রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি ইসলামী রাষ্ট্রের কেরানী, এমনকি চাপরাশী হবারও যোগ্য নয়। সে রাষ্ট্রের পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেল (IGP) ইসলামী রাষ্ট্রের একজন সাধারণ কনষ্টেবল হবারও যোগ্যতা রাখেনা। ধর্মহীন রাষ্ট্রের ফিল্ড মার্শাল এবং জেনারেলরা ইসলামী রাষ্ট্রে সাধারণ সিপাহী পদেও ভর্তি হবার যোগ্যতা রাখেনা। তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো পদ পাওয়া তো দূরের কথা, তার মিথ্যাচার,

ধোকাবাজি এবং বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হয়তো কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকেও সে রক্ষা পাবেনা।

মোট কথা, ধর্মহীন সেক্যুলার রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী করে যেসব লোক তৈরী করা হয়েছে এবং সেধরনের রাষ্ট্রের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে যাদের নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক, ভোটার, সেনা প্রধান, রাষ্ট্রদূত, মন্ত্রীবর্গ, মোটকথা নিজেদের সমাজ জীবনের প্রতিটি বিভাগ, পরিচালিকা যন্ত্রের প্রতিটি অংশ সম্পূর্ণ নতুনভাবে নিজস্ব আদর্শের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে হবে।

এ রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রয়োজন এমন সব লোকের, যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর ভয়। যারা আল্লাহর সম্মুখে নিজেদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে বলে তীব্র অনুভূতি রাখে। যারা দুনিয়ার উপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের দৃষ্টিতে নৈতিক লাভ ক্ষতি পার্থিব লাভ ক্ষতির চাইতে অনেক মূল্যবান। যারা সর্বাবস্থায় সেইসব আইন কানুন নিয়মনীতি ও কর্মপন্থার অনুসরণ করবে, যা তাদের জন্যে বিশেষভাবে প্রণীত হয়েছে। তাদের যাবতীয় চেষ্টা তৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বার্থের দাসত্ব আর কামনা বাসনার গোলামীর জিঞ্জির থেকে তাদের গর্দান হবে সম্পূর্ণ মুক্ত। হিংসা বিদ্বেষ আর দৃষ্টির সংকীর্ণতা থেকে তাদের মন মানসিকতা হবে সম্পূর্ণ পবিত্র। ধন সম্পদ ও ক্ষমতার নেশায় তারা উম্মাদ হবার নয়। ধন দৌলতের লালসা আর ক্ষমতার লিপ্সায় তারা কাতর হবার নয়।

এ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে এমন নৈতিক বলিষ্ঠতার অধিকারী একদল লোক প্রয়োজন, পৃথিবীর ধনভান্ডার হস্তগত হলেও, যারা নিখাঁদ আমানতদার প্রমাণিত হবে। ক্ষমতা হস্তগত হলে জনগণের কল্যাণ চিন্তায় যারা বিনিদ্র রজনী কাটাবে। আর জনগণও তাদের সুতীব্র দয়িত্বানুভূতিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণাধীনে নিজেদের জানমাল, ইজ্জত আবরুসহ যাবতীয় ব্যাপারে থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন এমন একদল লোকের, যারা কোনো দেশে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলে সেখানকার লোকেরা গণহত্যা, জনপদের ধ্বংসলীলা, যুলুম নির্যাতন, গুন্ডামী বদমায়েশী এবং ব্যভিচারের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হবেনা। বরঞ্চ বিজিত দেশের অধিবাসীরা এদের প্রতিটি সিপাহীকে পাবে তাদের জানমাল, ইজ্জত

আবরু ও নারীদের সতীত্বের পূর্ণ হিফাযতকারী। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তারা এতোটা সুখ্যাতি ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে যে, তাদের সততা, সত্যাবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিক ও চারিত্রিক মূলনীতির অনুসরণ এবং প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি পালনের ব্যাপারে গোটা বিশ্ব তাদের উপর আঁস্থাশীল হবে।

এ ধরনের এবং কেবলমাত্র এ ধরনের লোকদের দ্বারাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কেবলমাত্র এমন লোকেরাই ইসলামী হুকুমাত পরিচালনা করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে বস্তুবাদী স্বার্থান্বেষী (Utilitarian mentality) লোকদের দ্বারা কিছুতেই একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতে পারেনা। বরং রাষ্ট্রীয় কাঠমোর মধ্যে এ ধরনের লোকদের অস্তিত্ব অট্টালিকার অভ্যন্তরে উই পোকার অস্তিত্বের মতোই বিপজ্জনক। এরা পার্থিব স্বার্থ এবং ব্যক্তি ও জাতির স্বার্থে নিত্য নতুন নীতিমালা তৈরী করে। এদের মগজে না আছে আল্লাহর ভয়, না পরকালের। বরঞ্চ তাদের সমগ্র চেষ্টা তৎপরতার এবং নিত্য নতুন পলিসির মূলকথা হচ্ছে কেবলমাত্র পার্থিব লাভ লোকসানের 'ধান্দা'।

ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি

এতোক্ষণ ইসলামী রাষ্ট্রের যে রূপরেখা অংকন করা হলো, তার পুরো চিত্র স্মরণ রেখে চিন্তা করে দেখুন, এই লক্ষ্যে পৌছুবার সত্যিকার কর্মপন্থা কি হতে পারে? আগেই বলেছি, কোনো একটি সমাজের মধ্যকার নৈতিক চরিত্র, চিন্তা চেতনা, মন মানসিকতা, সভ্যতা সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ঐতিহ্যগত কার্যকারণের সমন্বিত কর্ম প্রক্রিয়ার ফল স্বরূপ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে ঠিক সে ধরনের একটি রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে। একটি গাছ অংকুরিত হওয়া থেকে আরম্ভ করে পূর্ণাংগ গাছে পরিণত হওয়া পর্যন্ত যদি তা লেবু গাছ হিসেবে পরিগঠিত হয়ে থাকে, তবে ফল ফলানোর সময় হঠাৎ করে সে গাছ কিছুতেই আম ফলাতে পারেনা। ঠিক তেমনি, ইসলামী রাষ্ট্রেরও অলৌকিকভাবে আবির্ভাব ঘটেনা।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে প্রথমে এমন একটি আন্দোলনের প্রয়োজন, যার বুনিয়াদ নির্মিত হবে সেই জীবন দর্শন, সেই জীবনোদ্দেশ্য, সেই নৈতিক মানদন্ড এবং সেই চারিত্রিক আদর্শের উপর, যা হবে ইসলামের প্রাণশক্তির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কেবল সেসব লোকেরাই ঐ আন্দোলনের নেতা ও কর্মী হবার যোগ্যতা রাখবে, যারা মানবতার এ বিশেষ

ছাঁচে ঢেলে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত হবে। সেইসাথে যারা সমাজে অনুরূপ মন মানসিকতা ও নৈতিক প্রাণশক্তি প্রচারের জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাবে।

অতঃপর এ একই ভিত্তির উপর এমন এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা ঐ বিশেষ টাইপের লোক তৈরী করবে। যা থেকে সৃষ্টি হবে এমনসব মুসলিম বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ, আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদ, মোটকথা জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় এমনসব বিশেষজ্ঞ তৈরী হবে, যারা নিজেদের মন মানসিকতা, ধ্যানধারনা ও চিন্তা দর্শনের দিক থেকে হবে পূর্ণ মুসলিম। যাদের ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে বাস্তবধর্মী এক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নীল নকশা তৈরী করার থাকবে পূর্ণাংগ যোগ্যতা। যারা খোদাদ্রোহী চিন্তানায়কদের মোকাবেলায় নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব (Intellectual Ieadership)-কে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার পূর্ণ যোগ্যতা রাখবে।[৪]

এই চিন্তা ও বুদ্ধি বৃত্তিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতেই ইসলামী আন্দোলনকে সমাজের বুকে ছড়িয়ে থাকা ভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রামে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে বিপদ মুসীবত ও অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে, ত্যাগ ও কুরবানীর নজরানা পেশ করে, মার খেয়ে খেয়ে এবং জীবন দিয়ে দিয়ে নিজেদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও মজবুত সংকল্পের প্রমাণ পেশ করতে হবে। পরীক্ষার চুল্লীতে দগ্ধ হয়ে তাদের খাঁটি সোনায় পরিণত হতে হবে। যেনো যেকোনো লোক তাদের নিখাঁদ খাঁটি (Finest standard) সোনাই দেখতে পায়। সংগ্রামের ময়দানে যে আদর্শের পতাকাবাহী হিসেবে তারা অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের প্রতিটি কথা ও কাজে সে আদর্শ প্রতিফলিত হতে হবে। তাদের প্রতিটি কথা দ্বারা যেনো দুনিয়ার সামনে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এমন নিষ্কলুষ, নিঃস্বার্থ, সত্যবাদী, পূত চরিত্র, ত্যাগী, নীতিবান ও খোদাভীরু লোকেরা মানবতার কল্যাণের জন্যে যে আদর্শিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছে, তাতে অবশ্যি মানুষের জন্যে সুবিচার, শান্তি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এধরনের চেষ্টা সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজের এমন সব লোকই ধীরে ধীরে এই আন্দোলনে শরীক হয়ে যাবে, যাদের প্রকৃতিতে সত্য ও সততার কিছু

৪. বিস্তারিত জানার জন্য আমার লেখা 'নয়া নিযামে তামীল' (শিক্ষা ব্যবস্থা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ) পুস্তিকা দ্রষ্টব্য। [গ্রন্থকার]

না কিছু উপাদান বিদ্যামান রয়েছে। এর মোকাবেলায় হীন চরিত্র ও নিকৃষ্ঠ পথের অনুসারীদের প্রভাব ধীরে ধীরে সমাজ থেকে বিলীন হয়ে যেতে থাকবে। জনগণের চিন্তা চেতনায় সৃষ্টি হবে এক প্রচন্ড বিপ্লব। সমাজ জীবনে উত্থিত হবে সেই বিশেষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার তীব্র দাবী। তখন এই পরিবর্তিত মানসিকতার সমাজে অপর কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু থাকার পথ হয়ে যাবে সম্পূর্ণ রুদ্ধ।

অবশেষে, এক অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক পরিণতির ফলে সেই কাংখিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যার জন্যে দীর্ঘদিন থেকে যমীনকে তৈরী করা হয়েছে। এভাবে সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে পূর্বোল্লিখিত শিক্ষা ব্যবস্থার বদৌলতে, তা পরিচালনার জন্যে একেবারে নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী থেকে নিয়ে মন্ত্রী ও গভর্নর পর্যায় পর্যন্ত সকল শ্রেণীর কর্মচারী ও কর্মকর্তা সেখানে মজুদ পাওয়া যাবে।

এ হলো সেই বিপ্লবের চিত্র ও সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক পদ্ধতি, যাকে ইসলামী বিপ্লব ও ইলামী রাষ্ট্র বলা হয়। পৃথিবীর সব বিপ্লবের ইতিহাস আপনাদের সামনে রয়েছে। একথা আপনাদের অজানা থাকার কথা নয় যে, একটি বিশেষ ধরনের বিপ্লব ঠিক সেই ধরনের আন্দোলন, অনুরূপ নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী, অনুরূপ সামষ্টিক ও সামাজিক চেতনা এবং অনুরূপ সাংস্কৃতিক ও নৈতিক পরিবেশই দাবী করে।

ফরাসী বিপ্লবের জন্যে সেই বিশেষ ধরনের নৈতিক ও মানসিক ভিত রচনারই প্রয়োজন ছিলো, যা তৈরী করেছিলেন রুশো, ভল্টেয়ার ও মন্টেস্কোর মতো দার্শনিক। কার্ল মার্ক্সের দর্শন এবং লেনিন ও ট্রটস্কির নেতৃত্ব আর হাজার হাজার সমাজতান্ত্রিক কর্মীর ত্যাগের বদৌলতেই রুশ বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল, যারা নিজেদের জীবনকে সমাজতন্ত্রের ছাঁচে ঢেলে গঠন করেছিল। জার্মানীর জাতীয় সমাজতন্ত্রের পক্ষে সেই বিশেষ নৈতিক, মনস্তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক মাটিতেই শিকড় গাড়া সম্ভব হয়েছিল, যা সৃষ্টি করেছিল হেগেল, ফিস্টে, গ্যেটে এবং নিটশের মতো অসংখ্য চিন্তাবিদদের দর্শন ও মতাদর্শ, আর হিটলারের দুর্ধর্ষ নেতৃত্ব। ঠিক তেমনি, ইসলামী বিপ্লবও কেবল তখনি সংঘটিত হতে পারবে, যখন কুরআনী দর্শন ও মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (স) আদর্শের ভিত্তিতে একটি প্রচন্ড গণআন্দোলন উত্থিত হবে এবং সামাজিক জীবনের মানসিক, নৈতিক, মনস্তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিসমূহকে সংগ্রামের প্রচন্ডতায় আমূল পরিবর্তিত করে দেয়া সম্ভব হবে।

একথা অন্তত আমার বুঝে আসেনা যে, কোনো জাতিপূজা ধরনের আন্দোলন দ্বারা কি করে ইসলামী বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে? কারণ, এর পটভূমিতে তো রয়েছে সেই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, যা বর্তমানে আমাদের দেশে চালু রয়েছে। আর এই শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি তো সুবিধাবাদী নৈতিকতা(Utilitarian morals) এবং প্রয়োগবাদী (Pragmatism) মানসিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সাবেক ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মসিয়ে রেনোর মতো অলৌকি পন্থায় আমি বিশ্বাস করিনা।[৫] আমি এই নীতিতে বিশ্বাসী যে, চেষ্টা সংগ্রাম যেমন হবে, ফলও ঠিক সে রকমই হবে।

অবাস্তব ধারণা-কল্পনা

কিছু লোকের ধারণা, মুসলমানরা সংগঠিত হলেই তাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তারা মনে করেন, মুসলমানরা এক কেন্দ্রে, এক প্লাটফরমে এবং একক নেতৃত্বের অধীনে একত্রিত হয়ে গেলেই 'ইসলামী রাষ্ট্র' কিংবা 'স্বাধীন ভারত স্বাধীন ইসলাম' এর উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে। কিন্তু মূলত এটাও জাতিপূজা ধরনেরই প্রোগ্রাম। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়না। জাতি হিসাবে যারাই নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, নিঃসন্দেহে এধরনের প্রোগ্রামই তারা গ্রহণ করবে। চাই তারা হিন্দু জাতি হোক, বা শিখ। কিংবা জার্মান হোক বা ইতালীয়। আসলে, জাতির প্রেমে নিমজ্জিত নেতা ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারদর্শী হয়ে থাকে। কর্তৃত্ব চালানো এবং দল পরিচালনার যোগ্যতা পুরোমাত্রায় তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যে কোনো জাতির মস্তক উন্নত করার ব্যাপারে এধরনের নেতা খুবই উপযোগী হয়ে থাকে। চাই সে হিটলার হোক কিংবা মুসোলিনী। অনুরূপ হাজারো লাখো নওজোয়ান যদি এধরনের কোনো নেতার নেতৃত্বে সুশৃঙ্খলভাবে আন্দোলন করতে পারে, তবে বিশ্বের বুকে যে কোনো জাতির শির উন্নত হতে পারে। চাই তারা জাপানী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হোক, কিংবা চৈনিক, তাতে কিছুই যায় আসেনা।

একইভাবে 'মুসলমান' যদি একটি বংশগত কিংবা ঐতিহাসিক জাতির নাম হয়ে থাকে আর উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে সেই জাতিটির উন্নতি সাধন, তবে তার বাস্তব সম্মত উপায় সেটাই, যা প্রস্তাব করা হচ্ছে। এর ফলে

---

৫. ফ্রান্স দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হবার কয়েকদিন পূর্বে মসিয়ে রেনো বেতার ভাষণে বলেছিলেনঃ "এখন কেবল অলৌককতাই ফরাসীকে রক্ষা করতে পারে। আমি অলৌকিকতায় বিশ্বাসী।" সে সময় মসিয়ে রেনো ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

একটি জাতীয় রাষ্ট্রও অর্জিত হতে পারে। কিংবা কমপক্ষে দেশ শাসনে ভাল একটা অংশীদারিত্ব লাভ হতে পারে। কিন্তু ইসলামী বিপ্লব এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিক থেকে এটাকে প্রথম পদক্ষেপও বলা যেতে পারেনা। বরঞ্চ এ এক বিপরীত পদক্ষেপ।

বর্তমানে মুসলমান নামে যে জাতিটি এদেশে বাস করছে, তাতে ভালমন্দ সকল প্রকার লোকই বিদ্যমান রয়েছে। চরিত্রগত দিক থেকে কাফিরদের মধ্যে যতো প্রকার লোক পাওয়া যায়, তত প্রকার লোক এ জাতিটির মধ্যেও বর্তমান। কোনো কাফির জাতি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে যত লোক যোগাড় করতে পারবে, সম্ভবত এ জাতিটিও সে কাজের জন্যে তত লোক একত্র করতে পারবে। সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, জিনা, ব্যাভিচার, মিথ্যা ও ধোকাবাজিসহ যাবতীয় নৈতিক অপরাধের কাজে এ জাতিটি কাফিরদের থেকে কিছুমাত্র কম পারদর্শী নয়। পেট ভর্তি করা এবং অর্থ উপার্জনের জন্যে কাফিররা যত পথ অবলম্বন করে, এ জাতির লোকেরাও ঠিক তত পথই অবলম্বন করে। জেনে বুঝে নিজ মোয়াক্কেলকে জিতানোর জন্যে একদল মুসলিম উকিল প্রকৃত সত্যকে চাপা দেবার সময় ঠিক ততটাই খোদার ভয়হীন হয়ে থাকে, যতটা হয়ে থাকে একজন অমুসলিম আইনজীবী। একজন মুসলিম ধনশালী সম্পদের প্রাচুর্য দ্বারা এবং একজন মুসলিম শাসক ক্ষমতার দাপটে ঠিক সেসব কাজই করে, যা করে থাকে অমুসলিম ধনী আর শাসকরা।

যে জাতি নৈতিক দিক থেকে এতোটা অধঃপতিত হয়েছে, তার সব ধরনের জগাখিচুড়ি চরিত্রের লোকদের একত্রিত ও সংগঠিত করে দিলেই, কিংবা রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে শৃগালের মতো চাতুর্য শিখিয়ে, অথবা সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেকড়ের মতো হিংস্র করে গড়ে তোলার মাধ্যমে জংগলের কর্তৃত্ব লাভ করা হয়তো সহজ হতে পারে। কিন্তু আমার কিছুতেই বুঝে আসেনা, তাদের দ্বারা আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করার কাজ কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এমতাবস্থায় কে তাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেবে? কে হবে তাদের সম্মুখে শ্রদ্ধাবনত? তাদের দেখে কার অন্তর হবে ইসলামের জন্যে আবেগাপ্লুত? তাদের 'পবিত্র জীবন ধারার' মাধ্যমে 'ইয়াদখুলূনা ফী দীনিল্লাহি আফওয়াজা'-এর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য কিভারে দেখানো যেতে পারে? কোথায় স্বীকৃতি পাবে তাদের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব? নিজেদের মুক্তির জন্যে বিশ্বের কোন্ লোকেরা তাদের স্বাগত জানাবে?

আল্লাহর কালেমার বিজয় যে জিনিসের নাম, তার জন্যেতো এমন সব কর্মী বাহিনীরই প্রয়োজন, যারা হবে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। কোনো প্রকার লাভ ক্ষতির পরোয়া না করেই আল্লাহর আইন ও বিধানের উপর যারা থাকবে অটল অবিচল। মূলত আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্যে এরকম একদল লোকেরই প্রয়োজন। চাই তারা বংশগত মুসলমানদের মধ্য থেকেই এগিয়ে আসুক, কিংবা আসুক অপর কোনো জাতি থেকে, তাতে কিছুই যায় আসেনা। আমাদের জাতির উপরে বর্ণিত ধরনের পঁচিশ পঞ্চাশ লাখ লোকের মেলা অপেক্ষা এরকম দশজন মর্দে মুমিন আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার কাজে অধিকতর মূল্যবান। সেরকম বিপুল তাম্রমুদ্রার ভান্ডার ইসলামের কোনো কাজে আসবেনা, যেগুলোর উপর স্বর্ণমুদ্রার মোহরাংকিত করা হয়েছে। মুদ্রার এইসব বহিরাংকন দেখার আগে ইসলাম জানতে চায়, এগুলোর অভ্যন্তরেও সত্যিই সোনা আছে কি? জাল স্বর্ণমুদ্রার বিরাট স্তুপ অপেক্ষা আল্লাহর দীনের কাজে একটি খাঁটি স্বর্ণমুদ্রাও অধিকতর মুল্যবান।

এছাড়া আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনের জন্যে প্রয়োজন এমন নেতৃত্ব, যারা সেসব নীতিমালা থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হতে প্রস্তুত নয়, যেগুলো প্রতিষ্ঠায় জন্যে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। এই আদর্শিক দৃঢ়তার ফলে সকল মুসলমানকে যদি না খেয়েও মরতে হয়, এমনকি তাদেরকে যদি হত্যাও করা হয়, তবু তাদের নেতৃবৃন্দ বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি বরদাশত করতে প্রস্তুত হবেনা।

যে নেতৃত্ব কেবল জাতির স্বার্থ দেখে, আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে জাতির লাভালাভের জন্যে যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা বোধ করে না এবং যার অন্তর খোদার ভয়শূন্য, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার মহান কাজে তা যে নিরেট অযোগ্য, সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

এরপর দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যস্থার অবস্থা দেখুন। 'হাওয়ার গতি যে দিকে, চলো সবে সেদিকে', এই বিখ্যাত প্রবাদটির উপর বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষা ব্যবস্থা সেই মহান ইসলামের সেবার জন্যে কি করে উপযুক্ত হতে পারে, যার অটুট ফায়সালা হচ্ছেঃ হাওয়ার গতি যেদিকেই বয়ে যাকনা কেন, তোমাদেরকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর নির্ধারিত পথেই চলতে হবে।

আমি অত্যন্ত আস্থার সাথে আপনাদের বলছি, আপনাদের হাতে একখন্ড স্বাধীন ভূমির কর্তৃত্ব পরিচালনার দায়িত্ব যদি অর্পণও করা হয়, আপনারা

মাত্র একদিনও সে রাষ্ট্রটি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে চালাতে সক্ষম হবেননা। একটি ইসলামী রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনী, আইন আদালত, সামরিক বাহিনী, রাজস্ব, অর্থ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার জন্যে যে ধরনের পরিগঠিত মানসিকতা এবং উন্নত নৈতিক শক্তি সম্পন্ন একদল লোকের প্রয়োজন, তার কোনো ব্যবস্থাই আপনারা করেননি। বর্তমানে দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তা থেকে অনৈসলামী রাষ্ট্রের সচিব এবং মন্ত্রী পর্যন্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু মনে কিছু করবেন না, তা থেকে একটি ইসলামী আদালতের চাপরাসী এবং ইসলামী পুলিশ বাহিনীর জন্যে সাধারণ কনস্টেবল পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হবেনা।

এই তিক্ত সত্য কথাটি কেবল আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেই প্রযাজ্য নয়। বরঞ্চ আমাদের প্রাচীন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযাজ্য। এই লোকগুলো তো কোনো প্রকার আন্দোলন এবং বিপ্লবেরই পক্ষপাতী নয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থা এতোটা প্রাচীন ও অকর্মণ্য হয়ে গেছে যে, আধুনিক কালের ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে বিচারপতি, অর্থমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, শিক্ষা পরিচালক এবং রাষ্টদূত সরবরাহ করার ব্যাপারে তা সম্পুর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এভাবে কোনো একটি দিক থেকেও কোনো প্রকার প্রস্তুতি ছাড়াই যারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে, তাদের মন মস্তিস্কে যে ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো ধারণাই বর্তমান নেই, তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকতে পারেনা।

কেউ কেউ এমন অসার কল্পনাও পোষণ করেন যে, অনৈসলামী ধাঁচে হলেও একবার মুসলমানদের একটা জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক। পরে ধীরে ধীরে শিক্ষা ব্যবস্থা ও নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের মাধ্যমে সেটাকে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপান্তরিত করা যাবে। কিন্তু ইতিহাস, রাষ্ট্র বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্য যা কিছু অধ্যয়ন করেছি, তার ভিত্তিতে আমি বলতে চাই, এ অসার কল্পনার কখনো বাস্তব রূপ লাভ করা সম্ভব নয়। এ অবাস্তব কল্পনা যদি বাস্তব রূপ লাভ করে, তবে আমি মনে করবো সেটা এক অলৌকিক কাজ। একথা আমি আগেও বলেছি, রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমাজ জীবনের গভীর তলদেশ পর্যন্ত শিকড় গেড়ে থেকে।

তাই যতক্ষণ না সমাজ জীবনে বিপ্লব সাধিত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কৃত্রিম পদ্ধতিতে রাষ্ট্র বিপ্লব সাধন করা সম্ভব নয়। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের মতো বিরাট যোগ্যতা সম্পন্ন শাসক পর্যন্ত এ

পন্থায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর পক্ষে এক বিরাট সংখ্যক তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ী সমর্থক থাকা সত্ত্বেও তিনি যে এ উদ্যোগে ব্যর্থ হলেন, তার কারণ হলো, সামগ্রিকভাবে তখনকার সমাজ এ পরিবর্তন ও বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত ছিলনা। মুহাম্মদ তুগলক এবং আলমগীরের মতো শক্তিশালী বাদশাহগণ নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে উন্নত দীনদারীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোনো প্রকার পরিবর্তন ও বিপ্লব সাধন করতে পারেননি। খলীফা মামুনুর রশীদের মতো পরাক্রমশালী শাসক পর্যন্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন সাধন করা তো দুরের কথা, তার বাহ্যিক রূপটিতে সামান্য পরিবর্তন করতে চেয়েও ব্যর্থকাম হন। এ হচ্ছে সে সময়কার অবস্থা, যখন এক ব্যক্তির শক্তি ও ক্ষমতা অনেক কিছুই করতে পারতো। এমতাবস্থায় গণতান্ত্রিক নীতির উপর যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হবে, এই বুনিয়াদী পরিবর্তন ও সংশোধনের কাজে তা কি করে সাহায্যকারী হতে পারে? একথা কিছুতেই আমার বুঝে আসে না।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা তো সেইসব লোকদের হাতেই আসবে ,যারা ভোটারদের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হবে। ভোটারদের মধ্যে যদি ইসলামী চিন্তা ও মানসিকতাই সৃষ্টি না হয়, যথার্থ ইসলামী নৈতিক চরিত্র গঠনের আগ্রহই যদি তাদের না থাকে এবং ইসলামের সেই সুবিচারপূর্ণ অলংঘনীয় মুলনীতিসমূহ তারা মেনে চলতে প্রস্তুত না হয়, যেগুলোর ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, তবে তাদের ভোটে কখনো খাঁটি মুসলমান নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে আসতে পারবেনা। এ পন্থায় তো কেবল ঐসব লোকেরাই নেতৃত্ব হাসিল করবে, যারা আদমশুমারী অনুযায়ী মুসলমান বটে, কিন্তু দৃষ্টিভংগি, কর্মনীতি এবং কর্মপন্থার দিক থেকে তাদের গায়ে ইসলামের বাতাসও লাগেনি।

স্বাধীন মুসলিম দেশে এ ধরনের লোকদের হাতে নেতৃত্ব আসার অর্থ হচ্ছে আমরা ঠিক সে জায়গায়ই অবস্থান করবো, যেখানে অবস্থান করছে অমুসলিম সরকার। বরং এ ধরনের মুসলিম সরকার আমাদেরকে তার চাইতেও নিকৃষ্ট অবস্থায় নিয়ে যাবে। কেননা, যে 'জাতীয় রাষ্ট্রের' উপর ইসলামের লেবেল প্রদর্শন করা হবে, ইসলামী বিপ্লবের পথ রোধ করার ক্ষেত্রে তার দুঃসাহস হবে অমুসলিমদের চাইতেও অধিক। যেসব কাজে অমুসলিম সরকার কারাদন্ডের শাস্তি প্রদান করে, সেইসব ব্যাপারে এ ধরনের 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী সরকার' ফাঁসি ও নির্বাসনের শাস্তি প্রদান করবে। এরপরও এধরনের রাষ্ট্র ও সরকারের নেতারা বেঁচে থাকা অবস্থায়

থাকবেন 'গাজী, আর মরণের পর 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি'। এধরনের 'জাতীয় রাষ্ট্র' ইসলামী বিপ্লবের পক্ষে সামান্যতম সহায়ক হবে বলে চিন্তা করাটাও মারাত্মক ভুল।

প্রশ্ন হলো, সেই রাষ্ট্রেও যদি আমাদেরকে সামাজিক জীবনের বুনিয়াদ পরিবর্তন করার সংগ্রাম করতেই হয় এবং রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ছাড়াই নিজেদের ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে তা করতে হয়, তবে আজ থেকেই আমরা সেই কর্মপন্থা অবলম্বন করবনা কেন? তথাকথিত সেই মুসলিম রাষ্ট্রের অপেক্ষায় কেন আমরা সময় এবং তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় শক্তি ব্যয় করবো, যে রাষ্ট্র সম্পর্কে আমরা জানি, তা আমাদের উদ্দেশ্য হাসিলের পথে কোনো উপকারে আসবেনা, বরঞ্চ অনেকটা প্রতিবন্ধকই প্রমাণিত হবে?[৬]

ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মনীতি

ইসলামী বিপ্লবের জন্যে সমাজ জীবনের আমূল পরিবর্তন এবং তা সম্পূর্ণ নতুনভাবে পরিগঠন করার সঠিক কর্মনীতি কি? এবার আমি সংক্ষিপ্তাকারে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বর্ণনার মাধ্যমে তা আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করতে চাই। তাছাড়া এই সংগ্রামকে সফলতার শিখরে পৌঁছে দেবার যথার্থ কর্মপন্থাই বা কি? তাও পরিষ্কার করতে চাই।

ইসলাম হলো সেই মহান আন্দোলনের নাম, যা মানব জীবনের গোটা ইমারত নির্মাণ করতে চায় এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দৃষ্টিভংগির উপর। সেই অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ আন্দেলন এই একই ভিত্তি ও পন্থায় চলে আসছে। আল্লাহর রসূলগণই (প্রতিনিধিগণ) ছিলেন এ আন্দোলনের নেতা। তাই আমাদেরকেও যদি এ আন্দোলন করতে হয়, তবে তা অবশ্যি এই সকল নেতৃবৃন্দের পদ্ধতিতেই করতে হবে। কারণ, এ ছাড়া এ বিশেষ ধরনের আন্দোলনের জন্যে অন্য কোনো কর্মনীতি নেই এবং হতে পারেনা।

এ প্রসংগে আম্বিয়ায়ে কিরামের (আঃ) পদচিহ্ন অনুসন্ধান শুরু করলেই আমাদেরকে একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাহলো, প্রাচীনকাল থেকে যেসব আম্বিয়ায়ে কিরাম অতীত হয়েছেন, তাঁদের কার্যক্রম সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত কিছুই জানতে পারিনা। কুরআনের সংক্ষিপ্ত ইশারা ইংগিত থেকে তাঁদের কার্যক্রম সম্পর্কে সামান্য ধারণা লাভ করা যায় বটে, কিন্তু তা থেকে

---

৬. পাকিস্তানের ইতিহাসে একথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে, তা পাঠকগণের সামনেই রয়েছে।

পূর্ণাংগ স্কীম তৈরী করা যেতে পারেনা। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে সাইয়্যেদুনা ঈসা আলাইহিস সালামের কিছু বাণী পাওয়া যায় (যা তাঁর বাণী বলে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়), তা থেকে ইসলামী আন্দোলনের সূচনাকাল সম্পর্কে কিছুটা ইংগিত পাওয়া যায়। জানা যায়, একেবারে প্রারম্ভিক অধ্যায়ে এ আন্দোলন কিভাবে পরিচালনা করতে হয় এবং কি কি সমস্যার সম্মুখীন তাকে হতে হয়। কিন্তু আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়গুলো সম্পর্কে সেখানে কোনো ইংগিত পাওয়া যায়না। কারণ, সেসব অধ্যায় ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনে আসেনি।[৭]

এব্যাপারে আমরা কেবল এক জায়গা থেকেই পূর্ণাংগ ও সুস্পষ্ট পথ নির্দেশনা পাই। তাহলো, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের যিন্দেগী। নিছক ভক্তি ও ভালবাসার কারণেই আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করছিনে, বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষেই এ আন্দোলনের যাবতীয় চড়াই উৎরাই ও বাধা বিপত্তির জগদ্দলে ভরা দীর্ঘ পথ কিভাবে পাড়ি দিতে হবে, তা জানার জন্যে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে আমরা বাধ্য। ইসলামী আন্দোলনের সকল নেতার মধ্যে কেবলমাত্র মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহই (সা) সেই একক নেতা, যাঁর জীবনে আমরা এ ইসলামী আন্দোলনের প্রারম্ভিক দাওয়াতী অধ্যায় থেকে নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাষ্ট্রের ধরন, শাসনতন্ত্র, অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র বিষয়ক পলিসি এবং আইন শৃংখলা ও প্রতিরক্ষা পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি অধ্যায় ও বিভাগ সম্পর্কে পূর্ণাংগ ও সুপ্রমাণিত বিস্তারিত তথ্যাবলী পাই। সুতরাং, আমি এই একমাত্র উৎসটি থেকেই যথাযথ কর্মনীতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি।

ক. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার আহ্বান

আপনাদের জানা আছে, রসূলুল্লাহ (সা) যখন ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে আদিষ্ট হন, তখন সারা বিশ্বে নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসংখ্য সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন ছিলো। তখন বর্তমান ছিলো রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যবাদ। শ্রেণী বৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছিল। অবৈধ অর্থনৈতিক ফায়দা (Economic exploitation)

---

৭. যেহেতু এ আন্দোলনের প্রাথমিক অধ্যায়কে বুঝার জন্যে ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতিও উপকারী, তাই এ নিবন্ধের শেষে নিউ টেস্টামেন্টের মার্ক, মথি ও লুক থেকে কিছু উদ্ধৃতি সংযোজন করে দেয়া হলো। [গ্রন্থকার]

লুটার প্রতিযোগিতা চলছিল। আর সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তার লাভ করেছিল নৈতিক অপরাধের জাল। স্বয়ং নবী করীমের (সা) স্বদেশে ছিলো অসংখ্য জটিল সমস্যা। এসব জটিল সমস্যার সমাধানের জন্যে দেশ ছিলো একজন সুযোগ্য লীডারের অপেক্ষায় উদগ্রীব।

তাঁর গোটা দেশ ও জাতি ছিলো অজ্ঞতা, নৈতিক অধঃপতন , দারিদ্র ও দীনতা এবং ব্যভিচার ও পারস্পরিক কলহ বিবাদে চরমভাবে নিমজ্জিত। কুয়েত থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণের গোটা উপসাগরীয় এলাকা এবং উর্বর শস্য শ্যামল ইরাক প্রদেশ পারস্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রেখেছিল জবর দখল করে। উত্তর দিকে রোমের শাসকরা হিজাযের সীমানা পর্যন্ত বিস্তার করে রেখেছিল তাদের সাম্রাজ্যবাদী থাবা। ইহুদী পুঁজিপতিরা স্বয়ং হিজাযের অর্থনীতিকেই করছিল নিয়ন্ত্রণ। গোটা আরবের লোকদের তারা আবদ্ধ করে রেখেছিল চক্রবৃদ্ধি সুদের অক্টোপাশে। তাদের শোষণ নিপীড়ন পৌঁছে গিয়েছিল চরম সীমানায়। পশ্চিম উপকূলের সোজা অপর পাড়ে হাবশায় প্রতিষ্ঠিত ছিলো খৃস্টান রাষ্ট্র। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে এরাই আক্রমণ চালিয়েছিল মক্কায়। হিজায এবং ইয়েমেনের মধ্যবর্তী প্রদেশ নাজরানে বাস করতো এই খৃস্টানদেরই স্বজাতির লোকেরা। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে তারা ছিলো জোটবদ্ধ। এমন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশেই অবস্থান করছিল তখনকার আরব দেশ, নবীর স্বদেশ।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্যে যে মহান নেতাকে নিযুক্ত করেন, তিনি গোটা বিশ্বের, এমনকি স্বদেশের এতোসব জটিল সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যার প্রতিও মনোনিবেশ করেননি। সকল সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি কেবল একটি কথার দিকেই মানুষকে আহবান জানালেনঃ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

"হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর সকল প্রভুত্ব শক্তিকে অস্বীকার করো, পরিত্যাগ কর এবং কেবলমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য মেনে নাও।"

এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর দৃষ্টিতে এই একটি ছাড়া অন্য সকল সমস্যার কোনো গুরুত্বই ছিলনা, কিংবা সেগুলো কোনো গুরুত্ব পাবারই উপযুক্ত ছিলনা। আপনারা জানেন, পরবর্তীকালে তিনি এ সবগুলো সমস্যার প্রতি পূর্ণ নযর দেন। একটি একটি করে সবগুলো সমস্যার সমাধান করেন। প্রাথমিক অবস্থায় এসব সমস্যা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে শুধু মাত্র একটি বিষয়ের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেয়া এবং তার সমাধানেই সকল শক্তি নিয়োগ করার

পেছনে ছিলো বাস্তব কারণ। এর মধ্যেই নিহিত ছিলো সকল সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি।

ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের নৈতিক ও সামাজিক জীবনে যতো অধঃপতনই সৃষ্টি হোক না কেন, সেগুলোর আসল কারণ হলো, মানুষের নিজেকে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী (Independent) এবং দায়িত্বহীন (Irresponsible) মনে করা। অন্য কথায়, নিজেকেই নিজের ইলাহ বানিয়ে নেয়া। কিংবা এর কারণ হলো, মানুষ কর্তৃক বিশ্ব জাহানের একমাত্র ইলাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকেও হুকুমকর্তা ও সার্বভৌম সত্তা হিসাবে মেনে নেয়া। চাই সে মানুষ হোক কিংবা অন্য কিছু। ইসলামের দৃষ্টিতে এই বুনিয়াদী ভুলকে তার অবস্থানের উপর বহাল রেখে কোনো প্রকার বাহ্যিক সংশোধন দ্বারা ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক অধঃপতন ও বিপর্যয় দূর করার ব্যাপারে কিছুতেই সফলতা লাভ করা যেতে পারেনা। এমতাবস্থায় এক স্থানে কোনো একটি অপরাধ দূর করা হলেও অন্য জায়গা দিয়ে তা মাথা গজিয়ে উঠবে।

সুতরাং কার্যকর সংশোধনের সূচনা কেবল একটি পন্থায়ই করা যেতে পারে। আর তাহলো, মানুষের মন মগজ থেকে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতার ধারণা নির্মূল করে দিতে হবে। তার মগজে একথা বসিয়ে দিতে হবে যে, তুমি যে জগতে বাস করছো, তা কোনো সম্রাট বা শাসকবিহীন সাম্রাজ্য নয়। নিঃসন্দেহে এ জগতের একজন সম্রাট রয়েছেন। তাঁর কর্তৃত্ব কারো স্বীকৃতির মুখাপেক্ষী নয়। তাঁর কর্তৃত্ব মিটিয়ে দেয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর সাম্রাজ্য থেকে অন্য কোথাও বেরিয়ে যাবার শক্তি তোমার নেই। তাঁর এই শাশ্বত ও অলংঘণীয় কর্তৃত্বের অধীনে অবস্থান করে নিজেকে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী মনে করাটা তোমার পক্ষে এক বিরাট বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার পরিণতি তোমাকেই ভোগ করতে হবে। তুমি যদি বুদ্ধিমান ও বাস্তববাদী হয়ে থাকো, তবে বুদ্ধিমত্তা ও বাস্তববাদীতার (Realism) দাবি হলো, সেই মহান সম্রাটের হুকুমের সম্মুখে মাথা নত করে দাও। তাঁর একান্ত অনুগত ও বাধ্যগত দাস হয়ে জীবন যাপন করো।

তাছাড়া এই বাস্তব জিনিসটিও ভালোভাবে পরিষ্কার হওয়া দরকার। তাহলো, এই গোটা বিশ্বজগতের কেবলমাত্র একজনই সম্রাট, একজনই মালিক এবং একজনই স্বাধীন সার্বভৌম কর্তা রয়েছেন। এখানে অপর

কারো কর্তৃত্ব করার কোনো অধিকার নেই। আর বাস্তবেও এখানে অপর কারো কর্তৃত্ব চলেনা। সুতরাং, তুমি তাঁর ছাড়া কারো দাস হয়োনা। অপর কারো কর্তৃত্ব স্বীকার করোনা। অপর কারো সামনে মাথা নত করোনা। এখানে 'হিজ হাইনেস' কেউ নেই। সকল 'হাইনেস' শুধুমাত্র সেই সত্তার জন্যেই নির্দিষ্ট। এখানে 'হিজ হোলিনেস' কেউ নেই। সমস্ত 'হোলিনেস' কেবলমাত্র সেই একমাত্র শক্তির জন্যেই নির্ধারিত। এখানে 'হিজ লর্ডশীপ' কেউ নেই। পূর্ণাঙ্গ 'লর্ডশীপ' কেবল সেই একমাত্র সত্তার। এখানে বিধানকর্তা কেউ নেই। আইন ও বিধানকর্তা কেবলমাত্র তিনি এবং কেবলমাত্র তাঁরই হওয়া উচিত। এখানে অন্য কোনো সরকার নেই। অন্নদাতা নেই। অলী ও কর্মকর্তা নেই। নেই কেউ ফরিয়াদ শুনার যোগ্য। ক্ষমতার চাবিকাঠি কারো কাছে নেই। কারো কোনো প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত সবাই এবং সবকিছু কেবল তাঁর দাসানুদাস।

সমস্ত মালিকানা, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। তিনিই একমাত্র 'রব' এবং মাওলা'। সুতরাং, তুমি সকল প্রকার গোলামী, আনুগত্য ও শৃংখলকে অস্বীকার করো। কেবলমাত্র তাঁরই গোলাম, অনুগত এবং হুকুমের অধীন হয়ে যাও। এটাই হচ্ছে সকল প্রকার সংস্কার সংশোধনের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরই ব্যক্তিগত চরিত্র এবং সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণাংগ অট্টালিকা সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে উঠে। হযরত আদম (আঃ) থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হবে, তা সবই একমাত্র এই বুনিয়াদী পন্থায়ই সমাধান হওয়া সম্ভব।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি, ভূমিকা এবং প্রারম্ভিক কার্যক্রম ছাড়াই সরাসরি এই মৌলিক সংশোধনের আহ্বান জানান। **এই আহ্বানের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত তিনি কোনো প্রকার বাকাঁচোরা পথ অবলম্বন করেননি। এ উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাজ করে মানুষের উপর কৌশলগত প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেননি, যে প্রভাব দ্বারা লোকদের পরিচালনা করে ধীরে ধীরে স্বীয় লক্ষ্যে উপনীত হতে পারতেন।** এসবের কিছুই তিনি করেননি। বরঞ্চ আমরা দেখি, হঠাৎ আরবের বুকে এক ব্যক্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্- আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই।' তাঁর দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যেও এই মৌলিক ঘোষণার চাইতে নিম্নতর

কোনো কিছুর প্রতি নিবদ্ধ হয়নি। কেবল নবী সুলভ সাহসিকতা আর আবেগ উদ্যমই এর কারণ নয়। বস্তুত এটাই ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃত কর্মনীতি। এছাড়া অন্যান্য উপায়ে যে প্রভাব, কার্যকারিতা ও কর্তৃত্ব সৃষ্টি হয়, এই মহান সংস্কার কাজের জন্যে তা কিছুমাত্র সহায়ক নয়। যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর মৌলিক আদর্শ ছাড়া অন্য কোনো কারণে আপনার সহযোগী হয়, এই মহান পুনর্গঠনের কাজে তারা আপনার কোনো উপকারে আসতে পারেনা।

এই মহান কাজে কেবল সেসব লোকই আপনার সহায়ক ও সহযোগী হতে পারে, যারা শুধুমাত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর' আওয়ায শুনে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ মহাসত্যকেই জীবনের বুনিয়াদ ও জীবনোদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয় এবং এরি ভিত্তিতে কাজ করতে প্রস্তুত হয়। সুতরাং, ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্যে যে বিশেষ ধরনের চিন্তা ও কর্মকৌশল প্রয়োজন, তার দাবীই হচ্ছে, কোনো ভূমিকা ছাড়াই সরাসরি তাওহীদের এই মৌলিক দাওয়াতের মাধ্যমে কাজ আরম্ভ করতে হবে।

তাওহীদের এই ধারণা নিছক কোনো ধর্মীয় ধ্যান ধারণা নয়। বরঞ্চ এ হচ্ছে এক পূর্ণাংগ জীবন দর্শন। স্বেচ্ছাচারিতা এবং গাইরুল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের উপর সমাজ জীবনে যে কাঠামো বিনির্মিত হয়েছে, এ দর্শন তাকে সম্পূর্ণ মুলোৎপাটিত করে দেয়। বিলকুল এক ভিন্ন ভিত্তি ও বুনিয়াদের উপর গড়ে তোলে নতুন অট্টালিকা।

আজ পৃথিবীর লোকেরা আপনাদের মুয়াযযিনের 'আশ্হাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর' বিপ্লবী আওয়াযকে নীরবে শুনে যায়। কারণ, ঘোষণাকারীও জানেনা সে কি ঘোষণা করছে? আর শ্রোতাদেরও নযরে পড়েনা এর কোনো অর্থ আর উদ্দেশ্য। কিন্তু ঘোষণাকারী যদি জেনে বুঝে ঘোষণা দেয় আর দুনিয়াবাসীও যদি বুঝতে পারে যে, এই ঘোষণাকারী বলছেঃ আমি কাউকেও সম্রাট মানিনা, শাসক মানিনা। কোনো সরকারকে আমি স্বীকার করিনা। কোনো আইন আমি মানিনা। কোনো আদালতের আওতাভুক্ত (Jurisdiction-এ) আমি নই। কারো নির্দেশ আমার কাছে নির্দেশ নয়। কারো প্রথা আমি স্বীকার করিনা। কারো বৈষম্য মূলক উচ্চ অধিকার, কারো রাজশক্তি, কারো অতি পবিত্রতা এবং কারো স্বেচ্ছাচারী উচ্চ ক্ষমতা আমি মোটেও স্বীকার করিনা। এক আল্লাহ্ ছাড়া আমি সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। সকলের থেকে আমি বিমুখ।

ঘোষক আর শ্রোতারা যদি ঘোষণার এই প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারে, তবে

কি আপনি মনে করছেন বিশ্ববাসী এই ঘোষণাকে সহজভাবে হজম করে নেবে? বরদাশত করবে নীরবে? বিশ্বাস করুন, সে অবস্থায় আপনি কারো সাথে লড়তে যান বা না যান, বিশ্ববাসী কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। এই ঘোষণা উচ্চারণ করার সাথে সাথেই আপনি অনুভব করবেন, গোটা বিশ্ব আপনার দুশমন হয়ে গেছে। চতুর্দিক থেকে সাপ, বিচ্ছু আর হিংস্র পশুরা আপনাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করছে।

খ. অগ্নি পরীক্ষায় নিখাদ প্রমাণিত হওয়া

মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা) যখন এই আওয়ায উচ্চারণ করেছিলেন, তখনো ঠিক এই একই অবস্থা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। ঘোষক জেনে বুঝেই ঘোষণা দিচ্ছিলেন। শ্রোতারাও বুঝতে পারছিল কি কথার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে? তাই এ ঘোষণার যে দিকটি যাকে আঘাত করেছে, সেই উদ্যত হয়ে উঠেছে একে নিভিয়ে দেবার জন্যে। পোপ ও ঠাকুররা দেখলো এ আওয়ায তাদের পৌরহিত্যের জন্য বিপজ্জনক। জমিদার মহাজনরা তাদের অর্থ সম্পদের, অবৈধ উপার্জনকারীরা অবৈধ উপার্জনের, গোষ্ঠী পূজারীরা গোষ্ঠীগত শ্রেষ্ঠত্বের (racial supererioty), জাতি পূজারীরা পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পথ ও মতের। মোটকথা এ আওয়ায শুনে সব ধরনের মূর্তি পূজারীরা নিজ নিজ মূর্তি বিচূর্ণ হবার ভয়ে আতংকিত হয়ে উঠল। তাই এতোদিন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধোমত্ত থাকা সত্ত্বেও, এখন সকল কুফরী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলো। 'আল কুফর মিল্লাতুন ওয়াহিদা' এই নীতি কথাটি তারা বাস্তবে রূপ দিলো। এক নতুন আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে তারা সমবেত হয়ে গেলো এক প্লাটফরমে। গঠন করলো ঐক্যজোট।

এই কঠিন অবস্থাতে মুহাম্মদ (সা) এর সাথী কেবল তারাই হলো, যাদের ধ্যান ধারণা ও মনমগজ ছিলো পরিষ্কার পরিশুদ্ধ। যাদের মধ্যে যোগ্যতা ছিলো সত্যকে বুঝবার এবং গ্রহণ করবার। যাদের মধ্যে সত্যপ্রিয়তা ছিলো এতোটা প্রবল যে, সত্য উপলব্ধির পর সে জন্যে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেবার এবং মৃত্যুকে আলিংগন করবার জন্যে ছিলো তারা সদা প্রস্তুত। এই মহান আন্দোলনের জন্যে এই ধরনের লোকদেরই ছিলো প্রয়োজন। এ ধরনের লোকেরা দু'একজন করে আন্দোলনে আসতে থাকে। সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে সংঘাত।

অতঃপর কারো রুজি রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কাউকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়। কেউ আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারো ছুটে

যায় বন্ধু, কারো হিতাকাংখী। কারো উপরে আসে মারধর। কাউকেও করা হয় জিঞ্জীরাবদ্ধ। কাউকে পাথর চাপা দিয়ে শুইয়ে রাখা হয় তপ্ত বালুকার উপর। কাউকেও জর্জরিত করা হয় গালি দিয়ে, কাউকেও বা পাথর দিয়ে। উৎপাটিত করা হয় কারো চোখ। বিচুর্ণ করা হয় কারো শির। নারী, সম্পদ, ক্ষমতা, নেতৃত্ব এবং সকল প্রকার লোভনীয় জিনিস দিয়ে খরিদ করার চেষ্টাও করা হয় কাউকে। এই সকল অগ্নিপরীক্ষা ইসলামী আন্দোলনের উপর এসেছে। আসা জরুরী ছিলো। এগুলো ছাড়া ইসলামী আন্দোলন না মজবুত হতে পারতো, আর না পারতো ক্রমবিকাশ ও প্রসার লাভ করতে।

এসব অগ্নিপরীক্ষা ইসলামী আন্দোলনের জন্যে ছিলো খুবই সহায়ক। এসব অগ্নিপরীক্ষার পয়লা ফায়দা এই ছিলো যে, এর ফলে ভীরু কাপুরুষ, হীন চরিত্র ও দুর্বল সংকল্পের লোকেরা এ আন্দোলনের কাছেই ঘেঁষতে পারেনি। তাই সমাজের মণিমুক্তগুলোই কেবল এসে শরীক হলো আন্দোলনে। আর এ মহান আন্দোলনের জন্যে প্রয়োজন ছিলো এদেরই। তাই যিনিই এ আন্দোলনে শরীক হলেন, কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়েই তাকে শরীক হতে হয়েছে। বস্তুত এক মহান বিপ্লবী আন্দোলনের উপযোগী শ্রেষ্ঠ লোকদের বাছাইর জন্যে এর চাইতে উত্তম আর কোনো পন্থা হতে পারেনা।

এই অগ্নি পরীক্ষার দ্বিতীয় ফায়দা হলো, এরকম কঠিন অবস্থার মধ্যে যারা আন্দোলনে শরীক হয়েছে, তাঁরা কোনো প্রকার ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতীয় স্বার্থে নয়, বরঞ্চ কেবলমাত্র সত্যপ্রিয়তা এবং আল্লাহ ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্যেই এই ভয়াবহ বিপদ মুসীবত ও দুঃখ লাঞ্ছনার মোকাবেলা করেছেন। এরই জন্যে তাঁদের সইতে হয়েছে শত অত্যাচার নির্যাতন। এরই জন্যে হতে হয়েছে আহত-প্রহৃত। এরই জন্যে তাদের পড়তে হয়েছে কায়েমী স্বার্থবাদীদের হিংস্র কোপানলে। কিন্তু এর ফল হয়েছে শুভ। এর ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী মন মানসিকতা। পয়দা হতে থাকে খাঁটি ইসলামী চরিত্র। আল্লাহর ইবাদতে সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হতে থাকে পরম আন্তরিকতা আর নিষ্ঠা।

আসলে বিপদ মুসীবতের এই মহা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইসলামী চরিত্র ও ভাবধারা সৃষ্টি হওয়া ছিলো এক স্বাভাবিক ব্যাপার। কোনো ব্যক্তি যখন একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্যে প্রবল উদ্যমে যাত্রা শুরু করে, আর তার সেই লক্ষ্য পথে যদি তাকে সম্মুখীন হতে হয় প্রাণান্তকর সংগ্রাম, চরম দ্বন্দ্ব সংঘাত, অবর্ণনীয় বিপদ মুসীবত, দুঃখ কষ্ট, সীমাহীন হয়রানী, যাতনাকর

আঘাত, অমানবিক কারা নির্যাতন, বিরামহীন ক্ষুধা আর দুঃসহনীয় নির্বাসনের, তবে এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে তার সেই মহান লক্ষ্য ও আদর্শের সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রবলভাবে রেখাপাত করে তার হৃদয়-মনে। তার মন মগজ, শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হতে থাকে তার সেই মহান লক্ষ্যেরই ফল্গুধারা। তার গোটা ব্যক্তি সত্তাই তখন তার জীবনোদ্দেশ্যের রূপ পরিগ্রহ করে।

লক্ষ্য অর্জনের পরিপূর্ণতা সাধনের এ সময়টিতে তাদের উপর ফরয করা হয় সালাত। এর ফলে, দূর হয়ে যায় তাদের দৃষ্টির সকল সংকীর্ণতা। গোটা দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি এসে নিবদ্ধ হয় আপন লক্ষ্যের উপর। যাঁকে তারা একচ্ছত্র সার্বভৌম শাসক বলে স্বীকার করে নিয়েছে, বার বার স্বীকৃতির মাধ্যমে তাদের ধ্যান ধারণা ও মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে যায় তাঁর প্রভুত্ব আর সার্বভৌমত্ব। যাঁর হুকুম ও নির্দেশনার ভিত্তিতে আঞ্জাম দিতে হবে জীবন ও জগতের সকল কাজ, তিনি যে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবকিছুই অবহিত। তিনি যে বিচার দিনের সম্রাট। তিনি যে সকল বান্দাহর উপর দুর্দণ্ড প্রতাপশালী- এই কথাগুলো বদ্ধমূল হয়ে যায় তাদের মন ও মস্তিষ্কে। কোনো অবস্থাতেই তাঁর আনুগত্য ছাড়া অপর কারো আনুগত্যের বিন্দুমাত্র চিন্তাও তাদের অন্তরে প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় সম্পূর্ণরূপে।

এই অগ্নি পরীক্ষা ও চরম সংঘাতের তৃতীয় সুফল এই ছিলো যে, এর ফলে একদিকে এই বিপ্লবী কাফেলায় যারা শরীক হচ্ছিল, বাস্তব ময়দানে তাদের হতে থাকে যথার্থ প্রশিক্ষণ। অপরদিকে দিনের পর দিন প্রসারিত সম্প্রসারিত হতে থাকে ইসলামী আন্দোলন। মানুষ যখন দেখতে থাকলো, কিছু লোক দিনের পর দিন মার খাচ্ছে। নির্যাতিত হচ্ছে। তখন স্বাবাভাবিকভাবেই এর আসল কারণ জানবার প্রবল আগ্রহ পয়দা হতে থাকে তাদের মনে। এই লোকগুলোকে নিয়ে কেন এতো হৈ হট্টগোল? -এই প্রশ্নের জবাব পেতে উৎসুক হয়ে উঠে তাদের মন। অতঃপর তাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি যখন জানতে পারতো, আল্লাহর এই বান্দাগুলো কোনো নারী, সম্পদ, প্রতিপত্তি বা কোনো প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বরং এক মহাসত্য তাদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে এবং তারা তা একনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরে আছে বিধায় এভাবে তাদের অত্যাচার করা হচ্ছে, তখন স্বঃতই সেই মহাসত্যকে জানার জন্যে তাদের মন হয়ে উঠতো ব্যাকুল।

অতপর যখন লোকেরা জানতে পারতো, সেই মহাসত্য হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', আর এ জিনিসই মানব জীবনে এমন ধরনের বিপ্লব সৃষ্টি করে,

এরই দাওয়াত নিয়ে এমনসব লোকেরা উত্থিত হয়েছে, যারা কেবল এই সত্যেরই জন্যে দুনিয়ার সমস্ত ফায়দা ও স্বার্থকে ভূলুণ্ঠিত করছে। নিজেদের জমি, মাল, সন্তান সন্তুতিসহ প্রতিটি জিনিস অকাতরে কুরবানী করছে, তখন তারা বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে যেতো। খুলে যেতো তাদের চোখ। ফেটে যেতো তাদের মন মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখা পর্দা। আর এই মহাসত্য তাদের হৃদয়ের মধ্যে বিদ্ধ হতো তীরের তীব্র ফলকের মতো। এরি ফলে সব মানুষ এসে শামিল হয়েছে এই আন্দোলনে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেবল সেই গুটি কয়েক লোকই এ আন্দোলনে শরীক হতে পারেনি, যাদেরকে আভিজাত্যের অহংকার, পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ আর পার্থিব স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এছাড়া সে সমাজের প্রতিটি নিঃস্বার্থ ও সত্যপ্রিয় লোককেই, কেউ আগে কেউ পরে, শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনে এসে শরীক হতে হয়েছে।

গ. নেতা ছিলেন আদর্শের মডেল

এ সময় আন্দোলনের নেতা নিজ ব্যক্তিগত জীবনের মাধ্যমে তাঁর এই আন্দোলনের যাবতীয় মূলনীতি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে মানব সমাজের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ এবং চালচলন ও গতিবিধির মধ্যে ফুটে উঠতো ইসলামের প্রাণসত্তা। এতে লোকেরা বাস্তবভাবে বুঝতে পারতো ইসলাম কি জিনিস? এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যাখ্যামূলক আলোচনার অবকাশ নেই। তাই অতি সংক্ষেপে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক এখানে উপস্থাপন করছি।

এই বিপ্লবী আন্দোলনের নেতার স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.) ছিলেন তৎকালীন আরবের সর্বাধিক অর্থশালী মহিলা। তিনি তাঁর স্ত্রীর এই অর্থ সম্পদ দিয়ে ব্যবসা করতেন। ইসলামের দাওয়াত শুরু করার পর তাঁর সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, অনুক্ষণ দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত থাকা এবং এর ফলে গোটা আরববাসীকে নিজের শত্রু বানিয়ে নেয়ার পর ব্যবসায়ের কাজ আর কিছুতেই চলা সম্ভব ছিলনা। নিজেদের হাতে পূর্বের যা কিছু জমা ছিলো, আন্দোলন সম্প্রসারণের কাজে স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তা নিঃশেষ করে দেন। এরপর তাদেরকে এক চরম অর্থ সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। দীন প্রচারের কাজে তিনি যখন তায়েফ গমন করেন, তখন হিজাযের এক সময়কার এই বাণিজ্য সম্রাটের ভাগ্যে সোয়ারীর জন্যে একটি গাধা পর্যন্ত জোটেনি।

কুরাইশের লোকেরা তাঁকে হিজাযের রাজ তখ্ত গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়। তারা বলে, আমরা আপনাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নেবো। আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে আপনার কাছে বিয়ে দেবো। সম্পদের স্তূপ আপনার পদতলে ঢেলে দেবো। এসব কিছু আমরা আপনার জন্যে করবো। করবো একটি শর্তে। তাহলো, এই আন্দোলন থেকে আপনাকে বিরত থাকতে হবে'। কিন্তু মানবতার মুক্তিদূত তাদের এইসব লোভনীয় প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। এইসবের পরিবর্তে তিনি তাদের উপহাস, তিরস্কার আর প্রস্তরাঘাতকেই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন।

কুরাইশ এবং আরবের সমাজপতিরা বললো, হে মুহাম্মদ, আপনার দরবারেতো সব সময় কৃতদাস, দরিদ্র এবং নীচু শ্রেণীর (নাউযুবিল্লাহ) লোকেরা বসে থাকে। এমতাবস্থায় আমরা কী করে আপনার দরবারে এসে বসতে পারি? আমাদের ওখানে যারা একেবারে নীচু শ্রেণীর, তারাই সব সময় আপনার চারপাশ ঘিরে থাকে। তাদেরকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিন, তবেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারি, কথাবার্তা বলতে পারি। কিন্তু গোটা মানবতার যিনি নেতা, যিনি এসেছেন মানুষের উঁচু নিচু শ্রেণীভেদ মিটিয়ে দেবার জন্যে, তিনি তো কিছুতেই সমাজপতিদের মন রক্ষার জন্যে দরিদ্রদের বিতাড়িত করতে পারেননা।

এই বিপ্লবী আন্দোলনের মহান নেতা মুহাম্মদ (সা) তাঁর আন্দোলনের ব্যাপারে নিজের দেশ, জাতি, গোত্র ও বংশের কারো স্বার্থেরই কোনো পরোয়া করেননি। আন্দোলনের ব্যাপারে কোনো স্বার্থের সাথেই তিনি আপোষ করেননি। তাঁর এই নৈতিক দৃঢ়তাই মানুষের মনে এক চরম আস্থার জন্ম দিলো যে, নিঃসন্দেহে মানুষের কল্যাণের জন্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। আর এ আস্থার ফলেই প্রত্যেকটি কওমের লোক এসে তাঁর আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। তিনি যদি কেবল নিজ খান্দানের কল্যাণ চিন্তা করতেন, তবে হাশেমী গোত্রের লোক ছাড়া আর কারোই এ আন্দোলনের প্রতি কোনো আগ্রহ থাকতো না। তিনি যদি কুরাইশদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যস্ত হতেন, তবে অকুরাইশ আরবরা তাঁর আন্দোলনে শরীক হবার কল্পনাই করতো না। কিংবা আরব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা যদি হতো তাঁর উদ্দেশ্য, তবে হাবশী বেলাল, রোমদেশীয় সুহাইব আর পারস্যের সালমানের (রা) কি স্বার্থ ছিলো তাঁর সহযোগিতা করার?

বস্তুত, যে জিনিস সব জাতির লোকদেরকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছে,

তা ছিলো নিরেট আল্লাহর দাসত্বের আহ্বান। ব্যক্তিগত, বংশগত, গোত্রগত ও জাতিগত স্বার্থের ব্যাপারে পরিপূর্ণ অনাগ্রহ। গোটা মানবতাকে খালেস্ আল্লাহর দাসত্বের প্রতি আহ্বানের ফলেই বংশ, বর্ণ ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধরনের মানুষ এ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণোৎসর্গ করতে সবাই প্রস্তুত হয়ে যায়।

তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য হন, তখনো তাঁর শত্রুদের প্রচুর ধন সম্পদ তাঁর কাছে আমানত ছিলো। এগুলো নিজ নিজ মালিকের কাছে ফেরৎ দেবার জন্যে তিনি হযরত আলীকে (রা) বুঝিয়ে দিয়ে যান। কোনো দুনিয়া পূজারী লোকের পক্ষে এধরনের সুযোগ হাতচাড়া করা সম্ভব নয়। সে সবকিছুই আত্মসাৎ করে সাথে নিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর দাস তখনো নিজের জানের দুশমন ও রক্ত পিপাসুদের সম্পদ তাদের হাতে পৌঁছে দেবার চিন্তা করেন, যখন তারা তাঁকে হত্যা করবার ফায়সালা গ্রহণ করে। নৈতিক চরিত্রের এই অকল্পনীয় উচ্চতা অবলোকন করে আরবের লোকেরা বিস্মিত না হয়ে পেরেছিল কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দুই বছর পর যখন বদর ময়দানে তারা তাঁর বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করলো, জন্মভূমি থেকে বিদায়ের কালেও যিনি মানুষের অধিকার ও আমানতের দায়িত্বের কথা ভোলেননি? হয়তো জিদের বশবর্তী হয়ে তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, কিন্তু তাদের বিবেক তাদের দংশন করছিল। আমার বিশ্বাস, বদর যুদ্ধে কাফিরদের পরাজয়ের নৈতিক কারণগুলোর মধ্যে এটাও ছিলো অন্যতম।

ঘ. আদর্শের কার্যকর স্বাভাবিক বিপ্লব

তের বছরের প্রাণান্তকর সংগ্রামের পর মদীনায় একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসে। এ সময় আন্দোলনে এমন আড়াই তিনশ লোক সংগৃহীত হয়ে যায়, যারা ইসলামের পূর্ণ প্রশিক্ষণ পেয়ে এতোটা যোগ্য হয়েছিল যে, তারা যে কোনো অবস্থা ও পরিস্থিতিতে মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম ছিলো। একটি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে এ লোকগুলো পুরোপুরি তৈরী করা ছিলো। সুতরাং সেই কাংখিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হলো। দশ বছর পর্যন্ত স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) এই রাষ্ট্রের নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি তাদেরকে রাষ্ট্রের সকল বিভাগ ইসলামী পদ্ধতিতে পরিচালনা করার প্রশিক্ষণ দিয়ে যান। এ যুগটি ছিলো ইসলামী আদর্শের তাত্ত্বিক ধারণার (Abstract Idea) স্তর পেরিয়ে

পূর্ণাংগ সমাজ কাঠামোর স্তরে পৌঁছার যুগ। এ যুগে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, সমরব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি সকল বিষয়ে ইসলামের নীতি ও পলিসি সুস্পষ্ট রূপরেখা লাভ করে। জীবনের প্রতিটি বিভাগের মূলনীতি প্রণীত হয়। সেই সব মূলনীতিকে বাস্তবে রূপদানও করা হয়।

এই বিশেষ কর্মনীতি ও কর্ম পদ্ধতিতে কাজ করার জন্যে শিক্ষা দীক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কর্মী বাহিনী তৈরী করা হয়। এই লোকেরাই বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামী শাসনের এমন আদর্শ নমুনা পেশ করেছিল যে, মাত্র আট বছর সময়কালের মধ্যে মদীনার মতো একটি ক্ষুদ্রায়তনের রাষ্ট্র গোটা আরব রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেখান থেকেই যে লোক ইসলামের বাস্তবরূপ দেখতে পেলো এবং এর শুভ পরিণাম অনুভব করতে পারলো, সে স্বঃতই বলে উঠলো, প্রকৃতপক্ষে এরই নাম মানবতা। এরি মধ্যে রয়েছে মানবতার কল্যাণ। দীর্ঘকাল ব্যাপী যারা মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো, শেষ পর্যন্ত তাদেরকেও এই মহান আদর্শ গ্রহণ করতে হয়েছিল। খালিদ বিন ওলীদ ইসলামের ছায়াতলে এসে যান। আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা ইসলাম কবুল করেন। আবু সুফিয়ান ইসলামের পক্ষে এসে যায়। হযরত হামযার (রা) হন্তা ওহাশী ইসলামের বিধান গ্রহণ করে নেন। হযরত হামযার (রা) কলিজা ভক্ষণকারী হিন্দাকেও শেষ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির সত্যবাণীর সম্মুখে মাথা নত করে দিতে হয়, যার চাইতে ঘৃণিত ব্যক্তি তার দৃষ্টিতে আর কেউই ছিলনা।

ঐতিহাসিকরা ভুল করেই তখনকার যুদ্ধগুলোকে বিরাট গুরুত্ব দিয়ে আলোকপাত করেছেন। এ ভুলের কারণে লোকেরা মনে করে বসেছে, আরবের সেই মহান বিপ্লব যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছে। অথচ আসল ব্যাপার এর সম্পূর্ণ উল্টো। সেই আট বছরে যে যুদ্ধগুলো দ্বারা আরবের যুদ্ধবাজ কওমগুলো তিরস্কৃত হয়েছিল, তার সবগুলোতে উভয়পক্ষের হাজার বারশ'র বেশী লোক নিহত হয়নি। পৃথিবীর বিপ্লবসমূহের ইতিহাস যদি আপনার জানা থাকে, তবে আপনাকে অবশ্যি স্বীকার করতে হবে, এ বিপ্লব রক্তপাতহীন বিপ্লব (bloodless revolution) নামে আখ্যায়িত হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

তাছাড়া এ বিপ্লবের ফলাফলও পৃথিবীর অন্যসব বিপ্লবের চাইতে ভিন্নধর্মী। এ বিপ্লবে কেবল রাষ্ট্র ব্যবস্থারই পরিবর্তন হয়নি। বরঞ্চ মানুষের

মন মানসিকতা এবং চিন্তাভাবনাও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এতে মানুষের দৃষ্টিভংগি পাল্টে যায়। চিন্তা পদ্ধতি বদলে যায়। জীবন যাপন পদ্ধতির পরিবর্তন হয়ে যায়। নৈতিক চরিত্রের জগতে আসে আমূল পরিবর্তন। স্বভাব ও অভ্যাস যায় পাল্টে।

মোট কথা, এ মহান বিপ্লব গোটা জাতির কায়া পরিবর্তন করে দেয়। ব্যাভিচারী নারী সতীত্বের রক্ষক হয়ে যায়। মদ্যপায়ী মাদক বিরোধী আন্দোলনের পতাকাবাহী হয়ে যায়। আগে যে চুরি করতো, এ বিপ্লব তার মধ্যে আমানতদারীর অনুভূতি এতোটা তীব্রভাবে জাগ্রত করে দেয় যে, এখন সে এ ভেবে বন্ধুর বাড়ীর খানা খেতেও দ্বিধান্বিত হয়, না জানি এটাও অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ভক্ষণ বলে গণ্য হয়ে যায়। এমনকি এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকে কুরআনের মাধমে তাদের আশ্বস্ত করতে হয়েছে যে, এ ধরনের খাবার খেতে কোনো দোষ নেই।[৮] ডাকাত ও ছিনতাইকারীরা এমন অনুপম দীনদার ও বিশ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, ইরান বিজয়ের সময় এদেরই একজন সাধারণ সৈনিক কোটি কোটি টাকা মূল্যের রাজমুকুট হস্তগত হবার পর, তা রাতের অন্ধকারে কম্বলের নিচে লুকিয়ে সেনাপতির নিকট পৌছে দেয়। সে এই গোপনীয়তা এই জন্যে অবলম্বন করেছিল, যাতে করে এই অস্বাভাবিক ঘটনা দ্বারা লোক সমাজে তার আমানতদারীর খ্যাতি ছড়িয়ে না পড়ে। তার ইখলাস বা নিয়্যতের নিষ্ঠার মধ্যে 'রিয়া' ও প্রদর্শনী মনোবৃত্তির কলঙ্ক লেগে না যায়।

যাদের কাছে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য ছিলনা, যারা নিজ হাতে স্বীয় কন্যাদের জীবন্ত কবর দিতো, তাদের মধ্যে জীবনের নিরাপত্তা ও মর্যাদাবোধ এমন তীব্রভাবে জাগ্রত হয়েছিল যে, নির্দয়ভাবে একটি মুরগী জবাই করতে দেখলেও তাদের কাছে চরম কষ্ট লাগতো। যাদের গায়ে কখনো সত্যবাদিতা ও ন্যায় পরায়ণতার বাতাস পর্যন্ত লাগেনি, তাদের মধ্যে ন্যায় পরায়ণতা, সততা ও সত্যবাদিতার এমন উচ্চতম বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছিল যে, খায়বরের সন্ধির পর এদের তহসীলদার ইহুদীদের কাছ থেকে সরকারী রাজস্ব আদায় করতে গেলে ইহুদীরা তাকে এই উদ্দেশ্যে একটা মোটা অংকের অর্থ দিতে চায়, যাতে করে সে সরকারী পাওনা কম করে নেয়। কিন্তু সে তাদের মুখের উপর উৎকোচ নিতে অস্বীকার করে দেয় এবং উৎপন্ন ফসল তাদের ও সরকারের মধ্যে সমান দুই স্তুপে বন্টন করে

---

৮. দেখুন সূরা নূর, আয়াতঃ ৬১।

তাদেরকে যে কোনো একস্তুপ গ্রহণ করার অধিকার প্রদান করে। মুসলিম তহসীলদারের ইনসাফ ও সততার এই চরম পরাকাষ্ঠা দেখে ইহুদীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল, আর অজ্ঞাতেই তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, 'এই ধরনের আদল ও ইনসাফের উপরই আসমান ও যমীন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

তাদের মধ্যে এমন সব শাসনকর্তার আবির্ভাব ঘটে, যাদের কোনো প্রাসাদ ছিলনা। বরঞ্চ তারা জনগণের সাথে বসবাস করতেন এবং তাদের মতো সাধারণ কুটীরেই বাস করতেন। পায়ে হেঁটে হাটবাজারে যেতেন। দরজায় দ্বার রক্ষী রাখতেন না। রাত দিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যে কেউ যখন ইচ্ছা তাদের সাথে সাক্ষাত করতে পারতো। তাদের মধ্যে এমন সব ন্যায়পরায়ণ বিচারপতির আবির্ভাব ঘটে, যাদেরই একজন জনৈক ইহুদীর বিরুদ্ধে স্বয়ং খলীফার দাবী একারণে খারিজ করে দেন যে, খলীফা স্বীয় গোলাম এবং পুত্র ব্যতিত আর কাউকেও সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করাতে পারেননি।[৯] তাদের মধ্যে এমন সব সেনাপতির আবির্ভাব ঘটে, যাদেরই একজন কোনো একটি শহর থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে শহরবাসীদের থেকে আদায়কৃত সমস্ত জিনিস এই বলে তাদের ফেরত দিয়ে যান যে, এখন থেকে যেহেতু আমরা তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে পারবো না, সে কারণে তোমাদের থেকে আদায়কৃত কর আমাদের হাতে রাখার কোনো অধিকার আমাদের নেই।

এমনি করে তাদের মধ্যে জন্ম নেয় অসংখ্য নির্ভীক রাষ্ট্রদূত। এদেরই একজন ইরানী সেনাধ্যক্ষের ভর দরবারে ইসলাম বর্ণিত মানবিক সুবিচারপূর্ণ নীতি নির্ভীকভাবে প্রকাশ করেন। তীব্র সমালোচনা করেন ইরানী শ্রেণী বৈষম্যের। আল্লাহ জানেন, সেদিনকার এই ঘটনায় কতো ইরানী সিপাহীর অন্তরে এই মানবধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ জাগ্রত হয়েছিল। ইসলামী বিপ্লব তাদের মধ্যে এমন সব তীব্র নৈতিক দায়িত্বানুভূতি সম্পন্ন নাগরিকের জন্ম দেয়, যাদের দ্বারা হাত কাটা এবং পাথর মেরে হত্যা করার মতো অপরাধ সংঘটিত হয়ে যাবার পরও, নিজেরাই এসে নিজেদের উপর দণ্ড প্রয়োগের দাবী করতে থাকে, যাতে করে তাদের চোর বা ব্যভিচারী হিসেবে আল্লাহর আদালতে হাজির হতে না হয়। ইসলামী বিপ্লব এমন সব আদর্শ সিপাহীর জন্ম দেয়, যারা বেতন বা

---

৯. এটা হযরত আলীর (রা) খিলাফত কালের ঘটনা।

কোনো পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্যে যুদ্ধ করেনি। বরঞ্চ কেবলমাত্র সেই মহান আদর্শের জন্যে যুদ্ধ করেছে, যার প্রতি তারা ঈমান এনেছিল। বেতন ভাতা তো তারা গ্রহণ করেইনি। তদুপরি নিজ খরচে তারা যুদ্ধের ময়দানে যেতো এবং গনীমতের মাল হস্তগত হলে, তা সরাসরি সেনাপতির দরবারে এনে হাজির করতো। নিজে হস্তগত করতো না।

এখন বলুন, সামাজিক চরিত্র ও সমষ্টিগত মানসিকতার এই আমূল পরিবর্তন কি শুধু যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা সম্ভব ছিল? ইতিহাস আপনাদের সম্মুখে রয়েছে। এমন কোনো উদাহারণ কি আপনারা তাতে পেয়েছেন যে, শুধুমাত্র তরবারি কোনো মানব গোষ্ঠীর মধ্যে এমন আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে?

মূলত এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার, যেখানে প্রথম তের বছরে মাত্র আড়াই তিনশ' লোক সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে পরবর্তী দশ বছরে গোটা দেশ মুসলমান হয়ে গেলো। এর রহস্য উদঘাটনে ব্যর্থ হয়ে লোকেরা নানা রকম অমূলক অবাস্তব ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করে থাকে। অথচ এর কারণ দিবালোকের মতো পরিষ্কার, সুস্পষ্ট।

যতোদিন এই নতুন আদর্শ অনুযায়ী মানব জীবনের বাস্তব রূপায়ণ লোকেরা দেখতে পায়নি, ততোদিন এই অভিনব আন্দোলনের নেতা আসলেই কি ধরনের সমাজ গড়তে চান, তা তারা বুঝে উঠতে পারেনি। এ সময় নানা ধরনের সন্দেহ সংশয় তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কেউ বলতো, এতো কেবল কবির কল্পনা বিলাস। কেউ বলতো, এটাতো কেবল ভাষার জাদুগিরি। কেউ বলতো, লোকটি আসলে পাগল হয়ে গেছে। আবার কেউ তাকে নিছক একজন কল্পনা বিলাসী (Visionary) লোক বলে ঘোষণা করতো।

এসময় কেবল অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী প্রতিভাবান লোকেরাই ঈমান এনেছিল। যারা বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলেন, এই আদর্শের মূলেই রয়েছে মানবতার কল্যাণের প্রকৃত চিহ্ন। কিন্তু যখন এই কল্পিত আদর্শের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, লোকেরা স্বচক্ষে এর বাস্তব চিত্র দেখতো পেলো এবং তাদের চোখের সামনে এর সীমাহীন সুফল দেখতে পেলো, তখন তারা বুঝতে পারলো, আল্লাহর এই বান্দাহ এই মহান সমাজ গঠনের জন্যেইতো এতো দুঃখ কষ্ট আর অত্যাচার নির্যাতন সয়ে আসছেন। এরপর জিদ আর হঠকারিতার উপর অটল থাকার আর কোনো সুযোগই থাকলো না। যার কপালেই দুটি

চোখ ছিলো, আর চোখের মধ্যে জ্যোতি ছিলো, তার পক্ষে এই চোখে দেখা বাস্তবতাকে অস্বীকার করার আর কোনো উপায় ছিলনা।

আসলে ইসলাম যে সমাজ বিপ্লব সংঘটিত করতে চায়, এটাই হলো তার সঠিক পন্থা। এটাই সেই বিপ্লবের রাজপথ। এ পন্থায়ই তার সূচনা হয় আর এ ক্রমধারায়ই হয় তা বিকশিত। এই বিপ্লবকে একটা মু'জিযা মনে করে লোকেরা বলে বসে, এ কাজ এখন আর সম্ভব নয়। এটাতো নবীর কাজ। নবী ছাড়া তা করা সম্ভব নয়। কিন্তু ইতিহাসের অধ্যয়ন আমাদের একথা পরিষ্কার করে বলে দেয়, এ বিপ্লব এক স্বাভাবিক বিপ্লব। এর মধ্যে কার্যকারণ পরম্পরার পূর্ণ যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই। আজো যদি ঐ একই পদ্ধতিতে কাজ করি, তবে একই ধরনের ফলাফল প্রকাশ হতে পারে।

তবে, একথা সত্য, এ কাজের জন্যে প্রয়োজন ঈমান, ইসলামী চেতনা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, মজবুত ইচ্ছাশক্তি এবং ব্যক্তিগত আবেগ উচ্ছাস ও স্বার্থের নিঃশর্ত কুরবানী। **এ কাজের জন্যে এমন একদল দুঃসাহসী যুবকের প্রয়োজন, যারা সত্যের প্রতি ঈমান এনে তার উপর পাহাড়ের মতো অটল হয়ে থাকবে। অন্য কোনো দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবেনা। পৃথিবীতে যাই ঘটুকনা কেন, তারা নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পথ থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হবেনা।** পার্থিব জীবনে নিজেদের ব্যক্তিগত উন্নতির সকল সম্ভাবনাকে অকাতরে কুরবানী করে দেবে। স্বীয় সন্তান সন্ততি, পিতা মাতা ও আপনজনের স্বপ্ন সাধ বিচূর্ণ করতে কুণ্ঠবোধ করবেনা। আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবদের বিচ্ছেদ বিরাগে চিন্তিত হবেনা। সমাজ, রাষ্ট্র, আইন, জাতি, স্বদেশ, যা কিছুই তাদের উদ্দেশ্য পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, তারই বিরুদ্ধে লড়ে যাবে। অতীতেও এ ধরনের লোকেরাই আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করেছে। আজো কেবল এ ধরনের লোকরাই আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করতে পারে। এ মহান বিপ্লব কেবল এ ধরনের লোকের দ্বারাই সংঘটিত হতে পারে। (তর্জমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বরঃ ১৯৪০ ইং।)

●

সংযোজন[১]

উপরোক্ত নিবন্ধে ইসলামী বিপ্লবের কর্মপন্থা সম্পর্কে যে স্পষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করা হলো, যদিও এ বিষয়ে অবহিত হবার জন্যে তাই যথেষ্ট, তারপরও এ সম্পর্কে হযরত মসীহ আলাইহিস সালামের কিছু বক্তব্য বিশেষ পরম্পরার সাথে এখানে উল্লেখ করা উপযোগী মনে করছি। তাঁর এ বক্তব্যগুলোতে ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক অধ্যায়ের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সাইয়্যেদুনা মসীহ আলাইহিস সালাম যে পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে ফিলিস্তিন বাসীদের কাছে 'হুকমাতে ইলাহিয়ার' দাওয়াত পেশ করেছিলেন, যেহেতু তার সাথে আমাদের বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতির মিল রয়েছে, সে জন্যে তাঁর কর্মপন্থার মধ্যে আমাদের জন্যে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ পাওয়া যেতে পারে।[২]

"একজন আলেম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মূসার দেওয়া হুকুমের মধ্যে সবচেয়ে দরকারী হুকুম কোনটা? উত্তরে ঈসা বলিলেন, সবচেয়ে দরকারী হুকুম এই, 'ইস্রায়েলীয়রা শুন, প্রভু, যিনি আমাদের খোদা,[৩] তিনি এক; আর তোমার সমস্ত অন্তর, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন এবং সমস্ত শক্তি দিয়া, প্রভু, যিনি তোমার খোদা, তাঁহাকে মহব্বত করিবে।' তখন সেই আলেম বলিলেন, 'হুজুর, খুব ভাল কথা। আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন, খোদা এক এবং তিনি ছাড়া আর কোনো খোদা নাই।'' (মার্ক/১২ঃ২৮-৩২)

"প্রভু, যিনি তোমার খোদা, তাঁহাকেই তুমি সেজদা করিবে, কেবল তাহারই সেবা করিবে।'' (লুক/৪ঃ৮)

"এই জন্যে তোমরা এইভাবে মুনাজাত করিও, আমাদের বেহেস্তী পিতা[৪], তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক। তোমার রাজ্য আসুক। তোমার

---

১. আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে পঠিত মূল নিবন্ধে এ অংশটুকু ছিলনা। পরবর্তীতে নিবন্ধটির প্রকাশকালে এ অংশ সংযোজন করে দিয়েছি। [গ্রন্থকার]

২. এখান থেকে সামনের দিকে বাইবেলের (নিউ টেস্টামেন্ট) থেকে যতোগুলো উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে, সেগুলোর বঙ্গানুবাদ হংকং থেকে মুদ্রিত ও বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা "ইঞ্জিল শরীফ'' থেকে হুবহু প্রদত্ত হলো। [অনুবাদক]

৩. খোদা বা খোদাবন্দ শব্দটি 'ইলাহ' শব্দের সমার্থক।

৪. বনী ইস্রায়ীলীরা প্রতীকীভাবে খোদার জন্যে 'পিতা শব্দ ব্যবহার করে থাকে। তারা তাঁকে সমগ্র সৃষ্টির পিতা বলে থাকে। এর অর্থ এ নয় যে, সমগ্র সৃষ্টি তাঁর সন্তান।

ইচ্ছা যেমন বেহেস্তে, তেমনি দুনিয়াতেও পূর্ণ হোক।" (মথি/৬ঃ৯-১০)

শেষ বাক্যটিতে হযরত মসীহ (আঃ) তাঁর উদ্দেশ্যের কথা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। সাধারণভাবে খোদার বাদশাহী বলতে কেবল তাঁর আধ্যাত্মিক বাদশাহীর যে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার লাভ করেছে, এ বাক্য তা পুরোপুরি খন্ডন করে দিয়েছে। পৃথিবীতে খোদার আইন ও শরয়ী বিধানের তেমনি প্রতিষ্ঠাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, যেমিন সমগ্র সৃষ্টির উপর তাঁর প্রাকৃতিক আইন কার্যকর রয়েছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই তিনি লোকদের তৈরী করছিলেন।

"আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে আসিয়াছি, এই কথা মনে করিওনা; আমি শান্তি দিতে আসি নাই। বরং মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে আসিয়াছি; ছেলেকে পিতার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, বউকে শ্বাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড়া করাইতে আসিয়াছি। নিজের পরিবারের লোকেরাই মানুষের শত্রু হইবে।"

"যে কেহ আমার চাইতে পিতা মাতাকে বেশী মহব্বত করে, সে আমার উপযুক্ত নয়। আর যে কেহ ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশী মহব্বত করে, সে আমার উপযুক্ত নয়। যে নিজেরে ক্রুশ লইয়া[৫] আমার পথে না চলে, সেও আমার উপযুক্ত নয়। যে কেহ নিজের জীবন রক্ষা করিতে চায়, সে তাহার সত্যিকারের জীবন হারাইবে; কিন্তু যে কেহ আমার জন্যে তাহার জীবন কোরবানী করিতে রাজী থাকে, সে তাহার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করিবে।" (মথি/১০ঃ৩৪-৩৯)

"যদি কেহ আমার পথে আসিতে চায়, তবে সে নিজের ইচ্ছামতো না চলুক,[৬] নিজের ক্রুশ বহন করিয়া আমার পিছে আসুক।" (মথি/১৬ঃ২৪)

"ভাই ভাইকে এবং পিতা ছেলেকে মারিয়া ফেলিবার জন্যে ধরাইয়া দিবে। ছেলে মেয়েরা পিতা মাতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাদের খুন করাইবে। আমার জন্যে সকলে তোমাদের ঘৃণা করিবে, কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকিবে, সে উদ্ধার পাইবে।" (মথি/১০ঃ২১-২২)

"দেখ, আমি নেকড়ে বাঘের মধ্যে ভেড়ার মতো তোমাদের পাঠাইতেছি।

---

৫. নিজের ক্রুশ নিয়ে চলার অর্থ হলো মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকা।

৬. অর্থাৎ আত্মপূজা ও ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করুক।

সাবধান থাকিও, কারণ মানুষ বিচার সভার লোকদের হাতে তোমাদের ধরাইয়া দিবে এবং তাহাদের মজলিশ খানায় তোমাদের বেত মারিবে। আমার জন্যই শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের লইয়া যাওয়া হইবে।" (মথি/১০ঃ১৬-১৮)

"যে আমার নিকট আসিবে, সে যেন নিজের পিতা মাতা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, এমনকি নিজেকে পর্যন্ত যেন আমার চেয়ে কম প্রিয় মনে করে। তাহা না হইলে সে আমার উম্মত হইতে পারে না। যে লোক নিজের ক্রুশ বহন করিয়া আমার পিছনে না আসে, সে আমার উম্মত হইতে পারে না।"

"আপনাদের মধ্যে যদি কেহ একটা উঁচু ঘর তৈরী করিতে চায়, তবে সে আগে বসিয়া খরচের হিসাব করে। সে দেখিতে চায় যে, উহা শেষ করিবার জন্য তাহার যথেষ্ট টাকা আছে কিনা। তাহা না হইলে, সে ভিত্তি গাঁথিবার পরে যদি সেই উঁচু ঘরটা শেষ করিতে না পারে, তবে যাহারা উহা দেখিবে তাহারা সকলে তাহাকে ঠাট্টা করিবে। তাহারা বলিবে, 'লোকটা গাঁথিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু শেষ করিতে পারিল না।' সেইভাবে আপনাদের মধ্যে যদি কেহ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার সমস্ত কিছু ছাড়িয়া না আসে, তবে সে আমার উম্মত হইতে পারে না।" (লুক/১৪ঃ২৬-৩৩)

এ সবগুলো আয়াত এ কথাই প্রমাণ করে যে, মসীহ (আঃ) কেবল একটি ধর্ম প্রচারের জন্যেই আবির্ভূত হননি, বরঞ্চ গোটা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করটাই ছিলো তার মূল উদ্দেশ্য। তাই, গোটা রোম সাম্রাজ্য, ইহুদী রাষ্ট্র এবং ফকীহ ও ফরীশীদের নেতৃত্ব, এক কথায় সকল আত্মপূজারী ও স্বার্থান্বেষীদের সাথে তাঁর সংঘাত সংঘর্ষের সমূহ আশংকা ছিলো বিদ্যমান। তাই তিনি সুস্পষ্টভাবে সবাইকে বলে দিচ্ছিলেন, আমি যে কাজ করতে যাচ্ছি তা সাংঘাতিক বিপজ্জনক। আমার সাথে কেবল তাদেরই আসা উচিত যারা এ সকল বিপদ মুসীবত বরদাশত করতে প্রস্তুত হবে।

"তোমাদের সংগে যে খারাপ ব্যবহার করে, তাহার বিরুদ্ধে কিছুই করিও না। বরং যে কেহ তোমার ডান গালে চড় মারে, তাহাকে অন্য গালেও চড় মারিতে দিও। যে কেহ তোমার কোর্তা লইবার জন্যে মামলা করিতে চায়, তাহাকে তোমার চাদরও লইতে দিও। যে কেহ তোমাকে তাহার বোঝা লইয়া এক মাইল যাইতে বাধ্য করে, তাহার সংগে দুই মাল যাইও।" (মথি/৫ঃ৩৯-৪১)

"যাহারা কেবল দেহ ধ্বংস করে, কিন্তু রূহকে ধ্বংস করতে পারে না, তাহাদের ভয় করিওনা। যিনি দেহ ও রূহ দুইটিই দোযখে ধ্বংস করিতে পারেন, বরং তাহাকেই ভয় কর।" (মথি/১০ঃ২৮)

"এই দুনিয়াতে তোমরা নিজেদের জন্য ধন সম্পদ জমা করিও না। এখানে মরিচায় ধরে ও পোকায় নষ্ট করে এবং চোর ঢুকিয়া চুরি করে। বরং বেহেস্তে তোমাদের ধন জমা কর।" (মথি/৬ঃ১৯-২০)

"কেহ দুই মনিবের সেবা করিতে পারে না। খোদা এবং ধন সম্পত্তি এই দুইয়ের এক সংগে সেবা করিতে পার না। কি খাইবে বলিয়া বাঁচিয়া থাকিবার বিষয়ে, কিংবা কি পরিবে বলিয়া দেহের বিষয়ে চিন্তা করিওনা। বনে পাখীদের দিকে তাকাইয়া দেখ; তাহারা বীজ বুনেনা, ফসল কাটেনা, গোলাঘরে জমাও করেনা, আর তবু তোমাদের বেহেস্তী পিতা তাহাদের খাওয়াইয়া থাকেন। তোমরা কি তাহাদের চেয়ে আরও মূল্যবান নও? তোমাদের মধ্যে কে চিন্তা ভাবনা করিয়া নিজের আয়ু এক ঘন্টা বাড়াইতে পারে? কাপড় চোপড়ের জন্য কেন চিন্তা কর? মাঠের ফুলগুলির কথা ভাবিয়া দেখ, সেইগুলি কেমন করিয়া বাড়িয়া উঠে। তাহারা পরিশ্রম করেনা, সুতাও কাটেনা। কিন্তু তোমাদের বলিতেছি, সোলায়মান রাজা এত জাঁকজমকের মধ্যে থাকিয়াও এইগুলির একটার মতোও নিজেকে সাজাইতে পারেন নাই। মাঠের যে ঘাস আজ আছে, আর আগামীকাল চুলায় ফেলিয়া দেওয়া হইবে, তাহা যখন খোদা এইভাবে সাজান; তখন ওহে অল্প বিশ্বাসীরা, তিনি যে তোমাদের নিশ্চয়ই সাজাইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমরা প্রথমে খোদার রাজ্যের বিষয়ে এবং তাহার ইচ্ছামতো চলিবার জন্য ব্যস্ত হও। তাহা হইলে ঐ সমস্ত জিনিসিও তোমরা পাইবে।" (মথি/১৬ঃ২৪-৩৩)

"চাও, তোমাদের দেওয়া হইবে; খোঁজ কর, পাইবে; দরজায় আঘাত কর, তোমাদের জন্য খোলা হইবে।" (মথি/৭ঃ৭)

সাইয়্যেদুনা ঈসা (আঃ) বৈরাগ্যবাদ, ত্যাগ এবং আজন্ম কৌমার্যের শিক্ষাদান করেছেন বলে সাধারণে ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে। অথচ এই বিপ্লবের সূচনাকালে লোকদের ধৈর্য, কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং আল্লাহ নির্ভরতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান ছাড়া কোনো গত্যন্তরই ছিল না। যেখানে একটি রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা পূর্ণ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং মানব জীবনের সমস্ত উপায় উপকরণ কব্জা করে রেখেছে, সেখানে কোনো একটি দল পূর্ণাংগ বিপ্লব সাধনের জন্যে অগ্রসর হতে পারে না, যতোক্ষণ না সে

মনমগজ থেকে জানমালের মহব্বত দূরে নিক্ষেপ করবে, দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদ বরদাশত করার জন্যে প্রস্তুত হবে, বহু পার্থিব লাভ কুরবানী করতে এবং অসংখ্য পার্থিব ক্ষতি স্বীকার করতে তৈরী হয়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে সমকালীন প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অর্থই হলো, সমস্ত বিপদ মুসীবতকে নিজেদের উপর ডেকে আনা। এ মহান কাজের জন্যে যারা উত্থিত হবে, তাদেরকে এক থাপ্পড় খেয়ে আরেক থাপ্পড়ের জন্যে অবশ্যি প্রস্তুত থাকতে হবে। জামা হাতছাড়া হলে চোগা হারাবার জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। খাদ্য ও পোষাকের চিন্তা থেকে তাদেরকে মুক্ত থাকতে হবে। সমকালীন জীবিকার ভান্ডার যাদের মুষ্টিবদ্ধে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আবার তাদের থেকে অন্ন বস্ত্র লাভ করার আশা করা যেতে পারে না। তাই কেবল সেই ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম, যে এসব উপায় উপকরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে, কেবল এক আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়ে যাবে।

"তোমরা যাহারা ক্লান্ত ও বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছ, তোমরা সকলে আমার নিকট আস; আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব। কারণ আমার জোয়াল বহন করা সহজ ও আমার বোঝা হাল্কা।" (মথি/১১ঃ২৮-৩০)

সম্ভবত এর চাইতে সংক্ষেপে এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় হুকুমাতে ইলাহীয়ার মেনিফেস্টো সংকলণ করা যেতে পারে না। মানুষের উপর মানুষের জোয়াল অত্যন্ত কঠিন এবং ভারী। এ বোঝার তলায় পিষ্ট মানুষকে হুকমাতে ইলাহীয়ার নকীব যে সংবাদ শুনাতে পারেন, তা হলো, যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার জোয়াল আমি তোমাদের উপর রাখতে চাই, তা যেমনি কোমল তেমনি হাল্কা।

"অইহুদীদের মধ্যে রাজারা প্রভুত্ব করেন। আর তাহাদের শাসনকর্তাদের বলা হয় উপকারী নেতা, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এই রকম হওয়া উচিত নয়। তোমাদের যে সবচেয়ে বড়, সে বরং সবচেয়ে যে ছোট তাহারই মত হোক, আর যে নেতা সে সেবাকারীর মতো হোক।" (লুক/২২ঃ২৫-২৬)

মসীহ আলাইহিস সালাম তাঁর সাথীদেরকেই (হাওয়ারী) এসব উপদেশ দিতেন। এ বিষয়ে ইঞ্জিলগুলোতে বেশ কিছু বাণী বর্তমান রয়েছে। সেগুলোর সারকথা হলো, ফেরাউন এবং নমরূদদের হটিয়ে তোমরা নিজেরাই আবার ফেরাউন নমরূদ হয়ে বসো না।

"মূসার শরীয়ত শিক্ষা দিবার ব্যাপারে আলেমরা ও ফরীশীরা[৭] মূসার

৭. শরীয়তের ধারক বাহকদের ফরীশী বলা হয়।

জায়গায় আছেন। এই জন্য তাহারা যাহা কিছু করিতে বলেন, তাহা করিও এবং যাহা পালন করিবার আদশে করেন, তাহা পালন করিও। কিন্তু তাহারা যাহা করেন, তোমরা তাহা করিওনা। কারণ তাহারা মুখে যাহা বলেন, কাজে তাহা করেন না। তাহারা ভারী ভারী বোঝা বাঁধিয়া মানুষের কাঁধে চাপাইয়া দেন, কিন্তু সেইগুলি সরাইবার জন্য নিজেরা একটা আংগুল নাড়াইতেও চান না। লোকদের দেখাইবার জন্যই তাহারা সমস্ত কাজ করেন। পাক কিতাবের আয়াত লেখা তাবিজ তাহারা বড় করিয়া তৈরী করেন। আর নিজেদের ধার্মিক দেখাইবার জন্য চাদরের কোণায় কোণায় লম্বা ঝালর লাগান। ভোজের সময়ে সম্মানের জায়গায় এবং মজলিস খানায় প্রধান আসনে তাহারা বসিতে ভালবাসেন। তাহারা হাটে বাজারে সম্মান খুঁজিয়া বেড়ান আর চান, যেন লোকেরা তাহাদের ওস্তাদ (রাব্বী) বলিয়া ডাকে।"

"ভন্ড আলেম ও ফরীশীরা, ধিক আপনাদের। আপনারা! লোকদের সামনে বেহেস্তী দরজা বন্ধ করিয়া রাখেন। তাহাতে নিজেরাও ঢুকেন না, আর যাহারা ঢুকিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহাদেরও ঢুকিতে দেন না।"

"আপনারা নিজেরা অন্ধ অথচ অন্যদের পথ দেখান। একটা ছোট মাছিও আপনারা ছাঁকেন অথচ উট গিলিয়া ফেলেন।"

"ভন্ড আলেম ও ফরীশীরা, ধিক আপনাদের! আপনারা চুন লাগানো সাদা কবরের মত, যাহার বাহিরের দিকটা সুন্দর, কিন্তু ভিতরে মরা মানুষের হাড় গোড় ও সমস্ত রকম ময়লায় ভরা। ঠিক সেইভাবে বাহিরে বাহিরে আপনারা লোকদের চোখে ধার্মিক, কিন্তু ভিতরে ভণ্ডামি ও পাপে পূর্ণ।" (মথি/২৩ঃ২-২৮)

সে সময়কার আলেম ও শরীয়তের ধারক বাহকদের এ ছিলো অবস্থা। ইলমের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেবল আত্মপূজার কারণে তারা ছিলো গুমরাহ, পথভ্রষ্ট। সাধারণ লোকদেরও তারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করছিল, আর এই বিপ্লবের পথে রোমের কাইজারদের থেকেও তারা বড় প্রতিবন্ধক ছিলো।

"তখন ফরীশীরা চলিয়া গেলেন এবং কেমন করিয়া ঈসাকে তাঁহার কথার ফাঁদে ফেলা যায়, সেই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাহারা হেরোদের[৮]

৮. মসীহ আলাইহিস সালামের যুগে ফিলিস্তিনের এক অংশে ভারতের দেশীয় রাজ্যের ন্যায় একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এটি রোম সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করতো। এর প্রতিষ্ঠাতা হেরোদের নামে সাধারণত এটিকে হেরোদী রাষ্ট্র বলা হতো। হেরোদের দল বলতে সেই রাষ্ট্রের পুলিশ বা সি,আই,ডির লোক বুঝানো হয়েছে।

দলের কয়েকজন লোকের সংগে নিজেদের কয়েকজন শাগ্রেদকে ঈসার নিকট পাঠাইলেন। তাহারা ঈসাকে বলিল, 'হুজুর, আমরা জানি, আপনি একজন সৎলোক। খোদার পথের বিষয়ে আপনি সত্যভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন। লোকে কি মনে করিবে না করিবে, তাহাতে আপনার কিছু যায় আসে না। কারণ আপনি কাহারও মুখ চাহিয়া কিছু করেন না। তাহা হইলে আপনি বলুন, রোম সম্রাটকে কি কর দেওয়া হালাল? আপনার কি মনে হয়? তাহাদের খারাপ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ঈসা বলিলেন, ভণ্ডেরা, কেন আমাকে পরীক্ষা করিতেছ? যে টাকায় কর দিবে তাহার একটা আমাকে দেখাও। তাহারা একটা দীনার ঈসার নিকট আনিল। তখন ঈসা তাহাদের বলিলেন, ইহার উপর এই ছবি ও নাম কাহার? তাহারা বলিল, রোম সম্রাটের। ঈসা তাহাদের বলিলেন, তবে যাহা সম্রাটের তাহা সম্রাটকে দাও, আর যাহা খোদার তাহা খোদাকে দাও। (মথি/২২ঃ১৫-২১)

এ ঘটনা থেকে জানা যায়, মূলত এটা ছিলো একটা ষড়যন্ত্র। ফরীশীরা আন্দোলন পাকা হবার আগেই সরকারের সাথে হযরত ঈসার (আঃ) সংঘর্ষ বাধিয়ে দিতে এবং আন্দোলন শিঁকড় গেড়ে বসার আগেই সরকারী শক্তি দ্বারা মূলোৎপাটিত করে দিতে চাইছিল। সে কারণে হেরোদী রাষ্ট্রের সিআইডিদের সামনে রোম সম্রাটকে কর দেয়া বৈধ কিনা, সে প্রশ্ন তারা উত্থাপন করেছিল। জবাবে হযরত ঈসা (আঃ) যে নিগূঢ় অর্থবহ কথাটি বলেছিলেন, বিগত দু'হাজার বছর থেকে খৃষ্টান অখৃষ্টান সকলে তার এই অর্থই করে আসছে যে, ইবাদত কর খোদার আর আনুগত্য কর সমকালীন প্রতিষ্ঠিত সরকারের। কিন্তু আসলে তিনি একথাও বলেননি যে, রোম সম্রাটকে কর দেয়া বৈধ। কারণ এমনটা বলা ছিলো তাঁর দাওয়াতের পরিপন্থী। আর তাকে ট্যাক্স না দেয়ার কথাও তিনি বলেননি। কারণ তখন পর্যন্ত তাঁর আন্দোলন এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যে, তিনি কর প্রদান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত দিতে পারতেন। এ জন্যেই তিনি তখন একটি সূক্ষ্ম কথা বলে দিলেন যে, কাইজারের নাম এবং ছবি তাকে ফেরত দাও। আর খোদা যে নিখাঁদ সোনা তৈরী করেছেন, তা তার পথে ব্যয় করো।

তাদের এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবার পর তারা স্বয়ং মসীহ আলাইহিস সালামের জনৈক সাহাবীকে ঘুষ দিয়ে এমন এক সময় মসীহ আলাইহিস সালামকে গ্রেফতার করিয়ে দিতে সম্মত করায়, যখন গণবিদ্রোহের কোনো আশংকা

থাকবে না। তাদের এ ষড়যন্ত্র সফল হয়। ইহুদী সক্রীটু হযরত মসীহকে গ্রেফতার করিয়ে দেয়।

"তখন সেই সভার সকলে উঠিয়া ঈসাকে প্রধান শাসনকর্তা পীলাতের নিকট লইয়া গেলেন। তাহারা এই কথা বলিয়া ঈসার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইতে লাগিল, 'আমরা দেখিয়াছি, এই লোকটা সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের লোকদের লইয়া যাইতেছে। সে সম্রাটকে কর দিতে নিষেধ করে এবং বলে, সে নিজেই মসীহ, একজন রাজা।"

"তখন পীলাত প্রধান ইমামদের এবং সমস্ত লোকদের বলিলেন, 'আমিতো এই লোকটির কোন দোষই দেখিতে পাইতেছি না।' কিন্তু তাহারা জিদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এহুদিয়া প্রদেশের সমস্ত জায়গায় শিক্ষা দিয়া সে এ লোকদের ক্ষেপাইয়া তুলিতেছে। গালীল প্রদেশ হইতে সে শুরু করিয়াছে, আর এখন এখানে আসিয়াছে।"

"কিন্তু লোকেরা ঈসাকে ক্রুশের উপর মারিয়া ফেলিবার জন্য চীৎকার করিতে থাকিল এবং শেষে তাহারা চেঁচাইয়া জয়ী হইল।" (লুক/২৩ঃ১-২৩)"

এভাবেই ঐ সমস্ত লোকদের হাতে মসীহ আলাইহিস সালামের মিশনের পরিসমাপ্তি ঘটে, যারা নিজেদেরকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকারী মনে করতো। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ অনুযায়ী মসীহ আলাইহিস সালামের নবুয়্যতকাল ছিলো দেড় থেকে তিন বছরের মতো। এ সংক্ষিপ্ত সময়কালে তিনি ঐ পরিমাণ কাজ করেছিলেন, যতোটা করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর মক্কী জীবনের প্রাথমিক দুই তিন বৎসরে। কোনো ব্যক্তি যদি ইঞ্জিলের উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর সাথে কুরআন মজীদের মক্কী সূরাসমূহ এবং মক্কায় অবস্থানকালীন হাদীসগুলোকে মিলিয়ে দেখেন, তবে তিনি এতদোভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য দেখতে পাবেন।

সমাপ্ত